একক ৩ক ❑ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতে মহাজনপদগুলির অবস্থা ও মগধের উত্থান (নন্দবংশ পর্যন্ত)

গঠন

৩ক.০ উদ্দেশ্য

৩ক.১ প্রস্তাবনা

৩ক.২ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

৩ক.৩ মগধের উত্থান

৩ক.৪ অজাতশত্রু (খ্রিস্টপূর্ব ৪৯৩-৪৬২ অব্দ) কুণিক

৩ক.৫ নন্দবংশ (খ্রিস্টপূর্ব ৩৬৪-৩২৪ অব্দ)

৩ক.৬ অনুশীলনী

৩ক.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩ক.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা
- মহাজনপদ হিসাবে মগধের উত্থানের কারণসমূহ
- নন্দবংশ পর্যন্ত মগধের বিভিন্ন বংশের শাসনকালে মগধের অবস্থা

৩ক.১ প্রস্তাবনা

আপনি নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী। এই এককে আপনার জন্য আলোচিত হবে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল। এই প্রসঙ্গে আপনি জানতে পারবেন তৎকালীন ভারতের প্রধান প্রধান মহাজনপদ কোন্‌গুলি ছিল, তাদের অভ্যুত্থানই বা হল কিভাবে।

মহাজনপদগুলির মধ্যে আবার মগধেই কেন একটি সাম্রাজ্যের অনুকূল পটভূমি প্রস্তুত হল তাও এই এককে আলোচিত হবে। এই এককের পরিধিতে আরো জানতে পারবেন নন্দবংশের শাসনকাল পর্যন্ত মগধ সাম্রাজ্যের ক্রমবিকাশের কাহিনী। প্রথমে হর্যঙ্কবংশীয় রাজা বিম্বিসার ও তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর রাজত্বকাল, তারপর শৈশুনাগবংশ শেষে মহাপদ্মনন্দের রাজত্বকালে নন্দবংশ তথা মগধের সম্প্রসারণের ইতিহাস এই এককে আলোচিত হবে।

৩ক.২ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সাধারণভাবে শুরু করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কী ছিল, তা বৈদিক সাহিত্য থেকে জানা যায় না। এজন্য *বৌদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকয়* এবং *জৈন ভাগবতী সূত্র*-র সাহায্য নিতে হয়। এই দুইটি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ভারতে তখন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। একটি অখণ্ড ভারতরাষ্ট্রের পরিবর্তে সেখানে ষোলোটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অথবা মহাজনপদ ছিল। বৌদ্ধ এবং জৈন দুইটি গ্রন্থেই ষোড়শ মহাজনপদগুলির নামের তালিকা পাওয়া যায়। জৈন গ্রন্থটিতে যে তালিকা আছে, তাতে ভারতের দূরপ্রাচ্য এবং সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলের মহাজনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তা থেকে মনে হয় যে, এই তালিকা পরবর্তীকালের। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজনৈতিক অবস্থার জন্য বৌদ্ধ তালিকাকে তাই অধিকতর প্রামাণ্য এবং নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

বৌদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকয়-তে যে ষোলোটি মহাজনপদের উল্লেখ আছে, সেগুলি হল কাশী, অঙ্গ, মগধ, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, সুরসেনা, অস্মক, অবন্তী, গান্ধার এবং কম্বোজ।

এই মহাজনপদগুলির মধ্যে প্রথম দিকে সম্ভবত কাশী ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। এর রাজধানী ছিল বারাণসী। বিভিন্ন জাতকে নগরীর শ্রেষ্ঠত্বের এবং এখানকার শাসকদের সাম্রাজ্যলিপ্সার পরিচয় পাওয়া যায়।

কোশল একটি বৃহৎ রাজ্য ছিল। এতে অযোধ্যা, সাকেত এবং শ্রাবস্তী এই তিনটি নগর ছিল। অযোধ্যা ছিল সরযূ নদীর তীরবর্তী একটি শহর। অযোধ্যা এবং সাকেত-কে অনেক সময় অভিন্ন মনে করা হয়। কিন্তু রিস ডেভিডস উল্লেখ করেছেন যে গৌতম বুদ্ধের সময় দুইটি শহরের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা জানা যায়। শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম সাহেথ-মাহেথ। এর অবস্থান ছিল রাপ্তী নদীর দক্ষিণ তীরে।

অঙ্গরাষ্ট্রের অবস্থান ছিল মগধের পূর্বে। চম্পা নদী মগধ এবং অঙ্গের মধ্যে সীমারেখা রচনা করেছিল। চম্পা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত চম্পানগরী এর রাজধানী ছিল। কানিংহামের মতানুসারে ভাগলপুরের নিকটবর্তী চম্পাপুর এবং চম্পানগর গ্রাম দুইটি এই প্রাচীন রাজধানীর স্মৃতি বহন করছে। অঙ্গ এবং মগধের মধ্যে তখন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র সংগ্রাম চলছিল। অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত তাঁর সমসাময়িক মগধের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিম্বিসার এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন।

মগধ বলতে বর্তমান দক্ষিণ বিহারের পাটনা এবং গয়া জেলাকে বোঝাত। গয়ার নিকটবর্তী গিরিব্রজ বা রাজগৃহ এর রাজধানী ছিল।

রিস ডেভিডস এবং কানিংহামের মতানুসারে আটটি মৈত্রীবদ্ধ গোষ্ঠী (অষ্ঠকুল) বজ্জির অন্তর্ভুক্ত ছিল। গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিদেহগণ, লিচ্ছবিগণ, জ্ঞাতৃকগণ এবং বজ্জি প্রধান। অবশিষ্ট গোষ্ঠীগুলির পরিচয় নিশ্চিত জানা যায় না। সম্ভবত নেপাল সীমান্তে মিথিলা বিদেহীদের রাজধানী ছিল। লিচ্ছবিগণের রাজধানী ছিল মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত বৈশালী বা বেসার। মহাবীর জৈন এবং তাঁর পিতা জ্ঞাতৃক কুলজাত ছিলেন। বৈশালীর উপকণ্ঠে কুণ্ডপুর এবং কোল্লগ জ্ঞাতৃকগণের বাসভূমি ছিল। বজ্জি শুধুমাত্র মিত্রসঙ্ঘের নাম ছিল না। মিত্রসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম গোষ্ঠীর নামও ছিল বজ্জি। লিচ্ছবিদের মত, বজ্জিদের নামও বৈশালী নগরের সঙ্গে জড়িত। তাই বৈশালী শুধু বজ্জিদের নয়, মিলিত অষ্টকুলের রাজধানী ছিল। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বিদেহ রাজবংশের

পতনের পর বজ্জি মিত্রসঙ্ঘ গঠিত হয়েছিল। ড. রায়চৌধুরী এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিবর্তনের দিক থেকে প্রাচীন ভারত এবং গ্রীসের মধ্যে সাদৃশ্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের মতো গ্রীসেও হোমরীয় যুগের রাজতন্ত্রের পর অভিজাত প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল।

একদা অনেক ঐতিহাসিক লিচ্ছবিদের বিদেশী মনে করতেন। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতে ওরা ছিল তিব্বতের লোক; ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে, পারস্যের। এই মতবাদগুলি এখন গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য এ বিষয়ে একমত যে, লিচ্ছবিগণ ক্ষত্রিয় ছিল। মহাপরিনির্ব্বাণসুত্ত-এ আছে যে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর লিচ্ছবিরা মল্লদের কাছে দূত পাঠিয়ে বলেছিল যে, বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তারাও তাই। মনুতেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। অঙ্গ-র মতো বৈশালীও মগধের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

মল্লদের অধিকৃত অঞ্চল তখন দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। একটি অংশের রাজধানী ছিল কুশিনারা বা কুশীনগর, অপর অংশের, পাবা। কুশীনগরের সঠিক অবস্থান কোথায় ছিল বলা যায় না। এ বিষয়ে উইলসনের মত মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মনে করা যায়। কানিংহামও এই মত সমর্থন করেন। তাঁর মত অনুসারে গোরক্ষপুর জেলার পূর্বে ছোট গণ্ডক নদীর তীরে কাশিয়া-র ধ্বংসাবশেষই ছিল প্রাচীন কুশীনগর। কাশিয়া থেকে সামান্য দূরে প্যাডারাওনা গ্রামকে কানিংহাম পাবা নগরী বলে চিহ্নিত করেছেন। মনু লিচ্ছবিদের সঙ্গে মল্লদেরও 'ব্রাত্যক্ষত্রিয়' বলে উল্লেখ করেছেন। বিদেহ-র মতো মল্লরাষ্ট্রেও প্রথম দিকে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে, কিন্তু বিম্বিসারের পূর্বে সেখানে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। এই মল্লগণ কখনও কখনও লিচ্ছবিদের শত্রু, কখনও বা মিত্ররূপে দেখা দিয়েছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ভদ্দশাল জাতকে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের উল্লেখ আছে, আবার জৈন কল্পসূত্র-এ তাদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

সে যুগে যে ক'টি রাজ্য কুরুরাজ্যকে ঘিরে ছিল, যমুনার নিকবর্তী চেদিরাজ্য ছিল তাদের অন্যতম। অনেকে মনে করেন, চেদিগণের দুইটি বসতি ছিল—একটি নেপালের পর্বতে, অন্যটি বর্তমান বুন্দেলখণ্ডে। জাতক অনুসারে এর রাজধানী ছিল শোথথিবতী, মহাভারত অনুসারে, শুক্তিমতী। সম্ভবত এই নাম দুটি অভিন্ন। ভারতের প্রাচীনতম উপজাতিদের মধ্যে চেদিগণ ছিল অন্যতম। হাতিগুম্ফা লেখ থেকে জানা যায় যে, পরবর্তীকালে চেদিগণের একটি শাখা কলিঙ্গে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিল।

বৎসরাজ্যটি আর্থিক দিক থেকে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। এই সমৃদ্ধির মূলে ছিল কার্পাস শিল্প। এলাহাবাদের নিকটবর্তী কৌশাম্ববী (বর্তমান কোশম গ্রাম) এর রাজধানী ছিল। এই রাজ্যের রাজা উদয়ন বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। উদয়নের সঙ্গে অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের কলহের অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। ভাসের *স্বপ্নবাসবদত্তা,* হর্ষবর্ধনের *রত্নাবলী* এবং *প্রিয়দর্শিকা*—এই তিনটি নাটকের নায়ক উদয়ন। *কথাসরিৎসাগর* গ্রন্থে তাঁর দিগ্বিজয়ের বর্ণনা আছে। প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্মবিরোধী হলেও পরে তিনি এই ধর্ম গ্রহণ করেন। জাতকের কাহিনী থেকে জানা যায় যে তাঁর পুত্র বোধি সুমসুমার গিরিতে বাস করত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এখানকার ভগ্‌গ রাজ্যটি বৎসরাজ্যের অধীন ছিল।

জাতক অনুসারে কুরুরাজবংশ যুধিষ্ঠিরের পরিবারভুক্ত ছিল। বুদ্ধের সময় এই রাজ্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশেষ ছিল না। এর রাজধানী ছিল দিল্লীর নিকটবর্তী ইন্দ্রপত্ত হবা ইন্দ্রপত্তন বা ইন্দ্রপ্রস্থ। অপর একটি উল্লেখযোগ্য শহর ছিল হস্তিনাপুর। এ ছাড়া কয়েকটি ছোট ছোট শহরের কথাও জানা যায়। যাদব, ভোজ এবং পাঞ্চালনগরের

সঙ্গে কুরুর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কুরুরাজ্যের ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং সেখানে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র বা সঙ্ঘশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এখান থেকে অনেকে বৎসরাজ্যে চলে যায় এবং সেখানে রাজতন্ত্র বজায় রাখে।

পাঞ্চাল বলতে বুন্দেলখণ্ড এবং মধ্য-দোয়াবের অংশবিশেষকে, (অন্যভাবে বুদাউন, ফরাক্কাবাদ এবং তার সংলগ্ন উত্তর প্রদেশের জেলাগুলিকে) বোঝায়। জাতক, মহাভারত এবং দিব্যবদান অনুসারে ভাগীরথী নদী এই রাজ্যটিকে উত্তর-পাঞ্চাল এবং দক্ষিণ-পাঞ্চাল, এই দুইটি অংশে বিভক্ত করেছিল। উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র, অর্থাৎ বর্তমান বেরিলী জেলার রামনগর। দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী ছিল ফরাক্কাবাদ জেলার অন্তর্গত কাম্পিল্য বা কাম্পিল। বিখ্যাত নগর, কান্যকুব্জ বা কনৌজ, পাঞ্চালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম দিকে এই রাজ্যে রাজতন্ত্র বলবৎ থাকলেও পরে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে, এখানে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল।

মৎস্য বলতে বর্তমান জয়পুর বোঝায়। এখানকার আলোয়ারের সবটা এবং ভরতপুরের অংশবিশেষ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিরাটের নামানুসারে এর রাজধানীর নাম ছিল বিরাটনগর বা বৈরাট। বিম্বিসারের পূর্ববর্তী সময়ে মৎসরাজ্যের কাহিনী জানা যায় না। *অর্থশাস্ত্র*-এ সঙ্ঘশাসিত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে মৎসের উল্লেখ নেই। সম্ভবত স্বাধীনতা হারানোর পূর্ব পর্যন্ত এই রাজ্যে রাজতন্ত্র বলবৎ ছিল। মৎস্য প্রথমে চেদিরাজ্যের এবং পরে মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। *মহাভারত*-এ চেদিরাজ সহজকে মৎসদেশের শাসক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অশোকের অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখ বৈরাটে পাওয়া গেছে।

যমুনাতীরে অবস্থিত মথুরা সুরসেনের রাজধানী ছিল। বৈদিক সাহিত্যে সুরসেন এবং মথুরার উল্লেখ নেই। গ্রীক লেখকগণ 'সৌরসেনয়' এবং 'মেথোরা'-র উল্লেখ করেছেন। *মহাভারত*-এ এবং পুরাণ-এ আছে যে যদুবংশ এখানে রাজত্ব করত। সুরসেনের রাজা অবন্তীপুত্র বুদ্ধের *অবশাল্ক* প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁর সহায়তায় বৌদ্ধধর্ম মথুরা অঞ্চলে প্রসারলাভ করে। অবন্তীপুত্র নাম থেকে মনে হয় যে, সুরসেন অবশ্যই মৌর্যসাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়েছিল। তিনি মথুরাকে কৃষ্ণ (হেরাক্লেস) উপাসনার কেন্দ্র বলে উল্লেখ করেছেন।

'অস্মক'-এর অবস্থিতি সম্পর্কে সামান্য অনিশ্চয়তা আছে। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে এই রাজ্যটি গোদাবরীতীরে অবস্থিত ছিল। *অর্থশাস্ত্র*-র টীকাকার ভট্টস্বামিন একে মহারাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করেছেন। পাণিনিও অস্মকগণের উল্লেখ করেছেন। তিনি দাক্ষিণাত্য এবং কলিঙ্গের উল্লেখ করায় তাঁর 'অস্মক' দাক্ষিণাত্যের 'অশ্বক' হতে পারে। কারও কারও মতে অস্মক বলতে হয়তো গ্রীক লেখকদের উল্লিখিত, উত্তর-পশ্চিম ভারতের 'আস্সাকেনয়' রাজ্যটি বোঝাত। ডঃ রায়চৌধুরী এই মত খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'অস্মক' শব্দটির অর্থ যদি প্রস্তরময় অঞ্চল হয় তাহলে এই নামটি কিছুতেই 'আস্সাকেনয়' রাজ্য সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারে না। কেননা, কেম্ব্রিজের ভারত ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে যে, 'আস্কেনয়' নামের সঙ্গে সংস্কৃত 'অশ্ব'-র বা ইরানীয় 'আস্প'-র যোগ আছে। তা যদি হয় তাহলে প্রস্তরময় অঞ্চল 'অস্মক'-কে অশ্ববহুল অস্সাকেনয় বা 'অশ্বক' থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। সুতরাং পাণিনির সূত্রে যে 'অস্মক'-এর উল্লেখ আছে, তার অবস্থান দাক্ষিণাত্যে ছিল মনে করতে হবে; এর রাজধানী ছিল পোতালি। হয়তো ইক্ষাকুবংশের নৃপতিগণ এই রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। প্রাচীন পালি সাহিত্যে অস্মক-কে উত্তরে

মূলক এবং অন্যদিকে কলিঙ্গ থেকে পৃথক করা হলেও, ডঃ ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, পরবর্তীকালে হয়তো দুইটি 'অস্মক'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। একটি *জাতক*-এ অস্মককে অবন্তীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলা হয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকে এই সংশ্লেষ সম্ভব হত না, যদি না মূলক অস্মক-এর অন্তর্ভুক্ত হত, অর্থাৎ অস্মক এবং অবন্তীর মধ্যবর্তী সীমারেখা এক না হত।

অবন্তী ছিল পশ্চিম ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, অবন্তী বলতে বর্তমান মালব, নিমার এবং মধ্যপ্রদেশের সংলগ্ন অঞ্চল বোঝাত। সম্ভবত বেত্রবতী নদী এই রাজ্যকে উত্তর ও দক্ষিণ, এই দুইটি অংশে বিভক্ত করেছিল। ডাঃ ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, উত্তর অবন্তীর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী এবং অবন্তী দক্ষিণাপথের রাজধানী ছিল নর্মদাতীরের মাহীষ্মতী বা মান্ধাতা। এই দুইটি নগরই রাজগৃহ থেকে দক্ষিণে প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত প্রসারিত রাজপথের উপর স্থাপিত হয়েছিল।

পুরাণ অনুসারে অবন্তীরাজ্যের প্রথম রাজবংশের নাম ছিল হৈহয়। এখানকার রাজা প্রদ্যোত বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর সময় এই রাজ্য, প্রতিবেশী রাজ্য বৎস, মগধ এবং কোশলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অবন্তী মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

গান্ধার বলতে পেশোয়ার এবং রাওয়ালপিণ্ডি জেলা দুইটি বোঝায়। *জাতক* অনুসারে কাশ্মীর এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রীক লেখক হেকাটায়স (খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৯-৪৮৬ অব্দ) কাশ্মীরকে 'গাণ্ডারীর নগর' বলে উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন বিখ্যাত শিক্ষা ও বাণিজ্যকেন্দ্র তক্ষশিলা এর রাজধানী ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে গান্ধারের রাজা পুককুসাতী বিম্বিসারের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি মগধে বন্ধুত্বের প্রতীকস্বরূপ দূত পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু অবন্তীরাজ প্রদ্যোতকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পারস্যসম্রাট গান্ধার জয় করেছিলেন। দারযবৌষের বেহিস্থান লেখতে (খ্রিস্টপূর্ব ৫২০-৫১৮ অব্দ) গান্ধারগণকে আকসেনীয় সাম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কম্বোজ 'উত্তরাপথের' অর্থাৎ ভারতে দূর-উত্তর অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন সাহিত্য এবং অশোকের লেখতে গান্ধার এবং কম্বোজের নাম সর্বদা একসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। তাই কম্বোজ, উত্তর-পশ্চিম ভারতে গান্ধারের নিকটবর্তী ছিল, মনে করা হয়। হাজারা জেলা এর অন্তর্গত এবং পশ্চিমে এর সীমা কাফিরিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। *মহাভারত*-এ রাজপুরকে কম্বোজের রাজধানী বলা হয়েছে। পরবর্তী বৈদিকযুগে কম্বোজে হয়তো ব্রাহ্মণ্যবিদ্যার প্রচলন ছিল। কিন্তু আরও পরে এখানে অনার্য সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল। *জাতক*-এ তার উল্লেখ আছে। *মহাভারত*-এ কম্বোজে রাজতন্ত্রশাসনের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু পরে এখানে সঙ্ঘশাসনের প্রবর্তন হয়েছিল। *অর্থশাস্ত্র*-এ তার উল্লেখ আছে।

উপরে ষোড়শ মহাজনপদের যে বিবরণ দেওয়া হল নানা কারণে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক ভূগোলের দিক থেকে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এ থেকে আমরা মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজনৈতিক চিত্রের আভাস পাই। ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য একেবারেই ছিল না। ভারত অনেকগুলি খণ্ড, ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এবং তারা প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হত। ষোলোটি মহাজনপদের অধিকাংশই ছিল বিহারে, উত্তরপ্রদেশে এবং মধ্যভারতে। আসাম, বঙ্গদেশ, ওড়িশা, গুজরাট, সিন্ধু এবং দূর-দক্ষিণ অঞ্চলে কোন মহাজনপদ ছিল না। দক্ষিণ ভারতে একটিমাত্র মহাজনপদ ছিল অস্মক।

সমগ্র পাঞ্জাবে মহাজনপদ ছিল দুইটি, গান্ধার ও কুরু। মধ্য পাঞ্জাবে একটিও ছিল না। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তখন গঙ্গা-যমুনার উপত্যকাই ছিল রাজনৈতিক অভিকর্ষের কেন্দ্রবিন্দু। তখন প্রচলিত শাসনব্যবস্থা রাজতন্ত্র হলেও উত্তর-পূর্ব ভারতে অনেকগুলি গণরাজ্য ছিল। বজ্জি ও মল্লরাষ্ট্র ছাড়াও, বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, কপিলাবস্তুর শাক্য, রামগামের কলিয়, সুমসুমার গিরির ভাগ্‌গ, অল্লকপপার বুলি, কেশপুত্তুর কালামা এবং পিপ্পলিবনের মোরিয়া প্রভৃতি উপজাতিগণের মধ্যে প্রজাতন্ত্র প্রচলন ছিল। কপিলাবস্তু ছিল নেপালের তরাই অঞ্চলে, বস্তি জেলায়। কলিয়গণ ছিল কপিলাবস্তুর শাক্যদের পূর্বদিকের প্রতিবেশী। কেশপুত্র ছিল কোশলে, আর পিপ্পলিবন ছিল কুশীনগরের অদূরবর্তী। অন্য উপজাতিগুলি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ভাগ্‌গগণ যে বৎসরাজ্যের অধীনতা স্বীকার করেছিল, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই স্বয়ংশাসিত গোষ্ঠীগুলির মধ্যেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ন্যায় প্রতিবাদী ধর্মের উদ্ভব ও প্রসার হয়েছিল। ডঃ মজুমদার তাই প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে স্বাধীন চিন্তার অনুকূল, এই ঘটনায় তা আরেকবার প্রমাণিত হয়।

৩ক.৩ মগধের উত্থান

ঋগ্বেদ-এ 'রাজা বিশ্বজনীনের' কল্পনা করা হয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের এমন কয়েকজন শাসকের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে দিগ্বিদিক জয় করেছিলেন। কিন্তু এই রাজ্যজয় স্থায়ী হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মহাজনপদগুলির গৌরব অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনীতিতে নূতন সম্ভাবনা দেখা দেয়। ভারতে তখন কয়েকটি শক্তিশালী রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই রাজ্যগুলি ক্রমশ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি গ্রাস করে। পরিশেষে এই রাজ্যগুলির মধ্যে একটি রাজতন্ত্র শাসিত রাজ্য (মগধ) অন্য রাজ্যগুলি জয় করে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। তৎকালীন ভারতের রাজনীতিতে গণরাজ্যগুলির অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তাদের কোন বৃহৎ ভূমিকা ছিল না। সেই ভূমিকা ছিল, কোশল, বৎস, অবন্তী এবং মগধ—এই চারটি রাজ্যের।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় মগধে একটি রাজবংশ শাসন করত। পুরাণ অনুসারে এই বংশের প্রথম রাজা শিশুনাগের নাম অনুসারে এই বংশের নাম শৈশুনাগবংশ। বৌদ্ধ লেখকগণের মতে প্রথম শাসকবংশের নাম হর্যঙ্ক দ্বিতীয় শাসকবংশের নাম শৈশুনাগ। পুরাণ অনুসারে বিম্বিসার শৈশুনাগ বংশের নৃপতি ছিলেন। অশ্বঘোষ তাঁর বুদ্ধচরিত গ্রন্থে বিম্বিসারকে শৈশুনাগবংশীয় বলেননি, হর্যঙ্ক কুলজাত বলেছেন। *মহাবংশ*-এ বলা হয়েছে যে, শিশুনাগ বিম্বিসারবংশীয়দের পর পৃথক একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আবার পুরাণে বলা হয়েছে যে, শিশুনাগ প্রদ্যোতগণের গর্ব হরণ করেছিলেন। অন্যান্য উপাদান থেকে জানা যায় যে, এই প্রদ্যোতগণ বিম্বিসারবংশীয়দের সমসাময়িক ছিলেন। পুরাণের এই বক্তব্য যদি সত্য হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, শিশুনাগ প্রথম প্রদ্যোতের, অর্থাৎ প্রদ্যোৎ মহাসেন-এর পরবর্তী ছিলেন। পালি গ্রন্থসমূহ এবং প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও নাটক থেকে জানা যায় যে, প্রদ্যোত মহাসেন বিম্বিসার এবং তাঁর পুত্রের, অর্থাৎ অজাতশত্রুর সমসাময়িক ছিলেন। সুতরাং শিশুনাগ নিশ্চিতভাবে এই সব রাজাদের পরবর্তী ছিলেন। পুরাণে শিশুনাগকে বিম্বিসারের পূর্বসূরি এবং বিম্বিসারবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে সত্য। কিন্তু অন্য কোন উপাদানে পৌরাণিক বিবরণের এই অংশের সমর্থন পাওয়া যায় না। বারাণসী এবং বৈশালী শিশুনাগের রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর পরবর্তী ছিলেন, কেননা তাঁরাই প্রথম এই অঞ্চলে মগধের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাছাড়া, বৈশালীতে একটি রাজকীয় বাসস্থান ছিল এবং এই বৈশালীকেই তিনি পরে তাঁর রাজধানীতে পরিণত করেছিলেন। তখন থেকে রাজগৃহ তার রাজকীয় মর্যাদা হারিয়েছিল এবং পরে আর তা ফিরে পায়নি। সুতরাং বলা যায় যে, রাজগৃহের গৌরব অপগত হওয়ার পর শিশুনাগ এসেছিলেন। বিম্বিসার-অজাতশত্রুর রাজত্বকালই ছিল রাজগৃহের গৌরবের যুগ। সুতরাং মগধের ইতিহাসে শিশুনাগের স্থান অবশ্যই তাঁদের পরে।

বিম্বিসার (খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৫-৪৯২) ছিলেন হর্যঙ্ক বংশের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত বিশেষণ 'শেনিয়' বা 'শ্রেণিক' থেকে ডঃ ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, সিংহাসন আরোহণের পূর্বে তিনি একজন সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু এই মত *মহাবংশ*-এর বিরোধী। *মহাবংশ* অনুসারে মাত্র পনেরো বৎসর তিনি তাঁর পিতা (ভক্তিয় বা মহাপদ্ম) কর্তৃক সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। এ থেকে বিম্বিসার সম্পর্কে দুইটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। এক, তিনি পূর্বে সেনাপতি ছিলেন না, এবং দুই তিনি হর্যঙ্ক বংশের প্রতিষ্ঠাও করেন নি। ডাঃ ভাণ্ডারকর আরও মনে করেন যে, শিশুনাগ ছিলেন ছোট নাগবংশের এবং বিম্বিসার ছিলেন বড় নাগবংশের। কিন্তু এই মতও গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত অনুসারে বিম্বিসার ছিলেন বড় নাগবংশের। কিন্তু এই মতও গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* অনুসারে বিম্বিসার ছিলেন হর্যঙ্ক বংশজাত তরুণ।

বিম্বিসারের রাজ্যাভিষেকের সঠিক সময় জানা যায় না। সিংহল দেশের ঐতিহ্য অনুসারে গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের ষাট বৎসর পূর্বে এই অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই পরিনির্বাণের আনুমানিক তারিখ খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৬ অব্দ। এই হিসাবে বিম্বিসারের রাজত্বের সূচনা খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে হয়েছিল বলা যায়।

বিম্বিসারের রাজত্ব থেকে মগধের অগ্রগতির ইতিহাস আরম্ভ হয়েছিল। তাঁর অঙ্গ জয়ের মধ্য দিয়ে ভারত ইতিহাসে যে অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল, কয়েক শতাব্দী ধরে মগধই ছিল রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু। সূর্যকে ঘিরে সৌরজগতের মত, মগধকে কেন্দ্র করেই উত্তর ভারতের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে মগধের এই উত্থান ইতিহাসে একটি আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এর পিছনে ব্যক্তিবিশেষের অবদান ছাড়াও কয়েকটি ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এবং সামাজিক কারণ ছিল।

ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষই সব, এই ধারণা যেমন ভ্রান্ত, তেমনই অন্যদিকে, ব্যক্তি কিছু নয়, বাস্তব সব নির্ধারণ করে, এই ধারণাও সত্য নয়। বিশেষত প্রাচীন যুগে, রাজতন্ত্র শাসিত রাজ্যে, ব্যক্তির অবদান বোধহয় কোনোমতেই অগ্রাহ্য করা যায় না। অনেকে বলেন, বাস্তব অবস্থা যখন পরিণতি লাভ করে, তখন যোগ্য নেতার আবির্ভাব ঘটে। সে যাই হোক, ইতিহাসে দেখা যায় যে উভয়ের যোগাযোগের ফলেই একটি রাজ্যের অগ্রগতি সম্ভব হয়। মগধের ক্ষেত্রে বিম্বিসারের সময় থেকে কয়েক শতাব্দী ধরে এই যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন—বাস্তব অবস্থা শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরে সমাজ ও অর্থনীতি প্রস্তুত করে না, বিদেশী আক্রমণ বা সেই আক্রমণের আশঙ্কা অভ্যন্তরীণ বাস্তব অবস্থাকে পরিণত রূপ দেয়, মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে সূচীমুখ করে তোলে। প্রাচীন ভারতে মগধকে কেন্দ্র করে দু'বার বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তার প্রথমটির নেপথ্যে ছিল আলেকজান্ডারের আক্রমণ এবং তৎপরবর্তী গ্রীক আক্রমণের আশঙ্কা, আর দ্বিতীয়টির প্রেক্ষাপটে ছিল ভারতের বৃহৎ অংশ জুড়ে বিদেশী শক-কুষাণদের উপস্থিতি।

ব্যক্তিত্ব বড়, না বাস্তব অবস্থা বড়, সেই কূটতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে, মগধে এই কয় শতাব্দী ধরে ব্যক্তিত্বের অভাব ঘটেনি। একথা ঠিক যে বিম্বিসার থেকে শুরু করে অশোক পর্যন্ত সকলেই সমান যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী নৃপতিদের সংখ্যাও খুব কম নয়। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, মহাপদ্মনন্দ এবং পরবর্তীকালে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং অশোক—অন্তত এই কয়টি নাম যথার্থই স্মরণযোগ্য। এঁদের কৃতিত্ব ক্রমশ আলোচ্য। এ প্রসঙ্গে মগধের ইতিহাসে দুইজন মন্ত্রীর অবদানও বিশেষ স্মরণীয়। একজন, ম্যাকিয়াভেলির সঙ্গে তুলনীয়, অজাতশত্রুর মন্ত্রী বস্সাকর, অন্যজন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের এবং অংশত বিন্দুসারের মন্ত্রী, মৌর্য সাম্রাজ্যের নেপথ্য নায়ক, কৌটিল্য বা চাণক্য।

ব্যক্তিত্ব ছাড়াও মগধের নিজস্ব যোগ্যতা খুব কম ছিল না। মগধ ছিল একটি ঘনবিন্যস্ত রাজ্য। প্রকৃতি এই রাজ্যকে নদী এবং পাহাড় দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। নদী-পাহাড়ের এই বেড়ার মধ্যে মগধ তার স্বাভাবিক আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে পেয়েছিল। মগধের রাজধানী রাজগৃহ পাঁচটি পাহাড় এবং একটি প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকায়, তার নিরাপত্তা ছিল আরও বেশি। নদীমাতৃক অঞ্চলের পলিমাটির প্রসাদে মগধের জমি উর্বর ছিল। তখনকার দিনেই এই জমিতেই বছরে দু'বার ফসল ফলানো যেত। এ ছাড়া 'হিরণ্যবাহ' শোন নদী মগধের সম্পদ ও সম্ভাবনাকে আরও বৃদ্ধি করেছিল। পরবর্তীকালের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরীও প্রকৃতি দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। গঙ্গা এবং তার দু'টি শাখা নদী, শোন ও গণ্ডক একদিকে যেমন মগধের আত্মরক্ষার সহায়ক হয়েছিল, তেমনই অন্যদিকে উত্তর ভারত ও সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগাযোগও সহজ করেছিল। মগধ তার হস্তিবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে পারত। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও মগধের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য এবং অগ্রগতি সম্ভব হত না যদি না ভারতের সদ্যোজাত লৌহযুগে, শক্তির প্রকৃত উৎস, লৌহ ও তাম্রের উপর তার প্রায় একচেটিয়া অধিকার থাকত। গয়া জেলার বারাবার পাহাড়ে, ধারওয়ারে লৌহখনি আবিষ্কৃত হয়েছিল। লৌহ ও তাম্রখনি সম্পদে ধলভূম ও সিংভূম জেলা ছিল ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কৌটিল্য এই সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন "রাজকোষ খনির উপর নির্ভর করে এবং সেনাবাহিনী, রাজকোষের উপর। খনিই হচ্ছ যুদ্ধদ্রব্যের গর্ভাশয়।"

মগধের খনিজ সম্পদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাণিজ্য। মগধের বাণিজ্য সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে হলে, তার ভৌগোলিক অবস্থান পুনরায় স্মরণ করা প্রয়োজন। একমাত্র দক্ষিণ দিক ভিন্ন মগধের অন্য তিন দিকই নদী বেষ্টিত। মগধের দক্ষিণে ছিল ছোটনাগপুরের পাহাড়, উত্তরে গঙ্গা, পূর্বে চম্পা এবং পশ্চিমে শোন। এ-যুগের বাণিজ্যে পণ্য চলাচলের জন্য রেলপথের যে ভূমিকা, প্রাচীন ভারতে নদীগুলির সেই ভূমিকা ছিল। সুতরাং নৌ-বাণিজ্যের জন্য মগধের অবস্থান বিশেষ অনুকূল ছিল। স্থলবাণিজ্যেও মগধের গুরুত্ব খুব কম ছিল না, কেননা ওড়িশা এবং উত্তর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্যপথ মগধের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল।

অন্য এক দিক থেকেও মগধের অবস্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। মগধ ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যভাগে। তার অবস্থিতি ছিল দু'টি সংস্কৃতির মধ্যস্থলে। তার একদিকে ছিল আর্যসংস্কৃতির দুর্গবিশেষ পাঞ্জাব, অন্যদিকে নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলের অনার্য সংস্কৃতি। মগধে দু'টি সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটায় সে লাভবান হয়েছিল। ধর্মশাস্ত্রকারেরা মগধের মানুষকে "মিশ্র" বলে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসে দেখা যায় যে সংস্কৃতির এই মিশ্রণ প্রায়ই মানুষের চিত্তবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ উন্নত করে। মগধের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মিশ্র সংস্কৃতির এই মগধ যেমন একদিকে

গৌতমকে বুদ্ধে পরিণত করেছিল, তেমনই অন্যদিকে তার রাজাদের একের পর এক রাজ্যজয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাছাড়া, মগধ দীর্ঘকাল আর্য আক্রমণ সীমার বাইরে থাকায়, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য ধর্মপ্রসূত সামাজিক বিধিনিষেধের বন্ধন এখানে বিশেষ ছিল না। একদিকে এই শৈথিল্য, অন্যদিকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সর্বজনীন আবেদন মগধের মানুষের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণকে প্রসারিত করে মগধকে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র হতে সাহায্য করেছিল। মধ্যযুগের ভারতের দিল্লির যে স্থান, প্রাচীন ভারতে মগধ সেই স্থান গ্রহণ করেছিল।

মগধের সম্প্রসারণের পিছনে আদর্শের প্রেরণাকে বোধ হয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীন ভারতের দু'টি বিপরীতমুখী চিন্তাধারা পাশাপাশি কাজ করে যেত। একটি স্থানীয় স্বাধীনতার চিন্তা, যা বিভিন্ন জনপদ এবং স্বয়ং গ্রামপঞ্চায়েতগুলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। প্রাচীন গ্রীসেও অনুরূপ চিন্তা স্বাধীন নগররাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন ভারতে উচ্চতর একটি আদর্শ ছিল, যা প্রাচীন গ্রীসে ছিল না। সে আদর্শটি হল সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার আদর্শ। তাই প্রাচীন গ্রীসে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস কখনও পরীক্ষার স্তর অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু প্রাচীন ভারতে এই প্রয়াস একাধিকবার সফল হয়েছে। এই প্রয়াসের সঙ্গে আরও একটি ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হয়েছিল। এই আকাঙ্ক্ষা ছিল মহাপুরুষের জন্য। ধর্মের ক্ষেত্রে এই আকাঙ্ক্ষা বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবকে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে মগধ সাম্রাজ্যের উত্থানকে সম্ভব করেছিল।

সর্বশেষে বলা যায় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর খণ্ড, ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত ভারতে মগধের এই উত্থানকে সম্ভব করেছিল। তখন ভারতের অবস্থা ছিল অষ্টাদশ শতকের অবস্থার মতো। ভারতে সর্বব্যাপী এই অনৈক্যের পিছনে প্রধানত দুইটি কারণ ছিল। একটি গভীর অরণ্যসঙ্কুল বিন্ধ্য পর্বতমালা, অন্যটি ভারতে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির অস্তিত্ব। এর ফলে ভারতে সমাজ-সংহতি একেবারেই ছিল না। মগধের শাসকেরা এই অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল। তাঁরা সফল হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁদের কাজ খুব সহজ ছিল না। কেননা, মগধের সাম্রাজ্যবাদকে বারবার প্রজাতন্ত্রবাদের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল।

বিম্বিসার হর্যঙ্ক বংশের প্রথম শাসক ছিলেন না, কিন্তু তিনিই প্রথম এই বংশের গৌরবের কারণ হয়েছিলেন। মার্ক অফ্ ব্রান্ডেনবার্গের ইতিহাসে গ্রেট ইলেকটরের যে স্থান, মগধের ইতিহাসে তাঁর স্থানও সেখানে। মগধের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর পদক্ষেপই প্রথম। তাঁর রাজত্বকালে আরও একটি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এটি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য। গৌতম এই সময়েই বোধি লাভ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব তখনই হয়েছিল।

সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক কারণে বিম্বিসারের সামনে যে সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল, তিনি তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। অংশত বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে এবং অংশত যুদ্ধের সাহায্যে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিলেন। কোশল, লিচ্ছবি, বিদেহ এবং মদ্রর (মধ্য পাঞ্জাব) সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কোশলের রাজা প্রসেনজিতের ভগ্নীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। এই বিবাহের ফলে কাশীগ্রাম তিনি যৌতুক হিসাবে পেয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী লিচ্ছবি নরপতি চেতকের কন্যা। এই বিবাহের ফলে তাঁর রাজ্যসীমা নেপাল পর্যন্ত প্রসারের পথ সুগম হয়েছিল। বৈদেহী বাসবী ছিলেন তাঁর তৃতীয়া স্ত্রী। মদ্র রাজকন্যা খেমাও তাঁর অন্যতম পত্নী ছিলেন।

এই বিবাহসম্পর্কের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম ও উত্তর সীমান্ত সুরক্ষিত করে এবং নিজের শক্তি বৃদ্ধি করবার

পর বিম্বিসার প্রতিবেশী অঙ্গ আক্রমণ করেন। অনেকে মনে করেন যে অঙ্গের রাজা ব্রহ্মদত্ত বিম্বিসারের পিতাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। সুতরাং অঙ্গ-র বিরুদ্ধে বিম্বিসারের এই যুদ্ধকে প্রতিহিংসার যুদ্ধ বলা যায়। চরম গৌরবের দিনে বঙ্গদেশ অঙ্গ-র অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর রাজধানী ছিল চম্পা। অঙ্গজয়ের ফলে, পূর্ব-বিহার মগধ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই জয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তখন চম্পা ছিল একটি নদী-বন্দর। এই বন্দর থেকে বাণিজ্যতরী গঙ্গা দিয়ে এবং উপকূল রেখা ধরে দক্ষিণ ভারতে যেত এবং সেখান থেকে মসলা এবং মণিমুক্তা উত্তর ভারতে নিয়ে আসত। অঙ্গ শুধু বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত না, গঙ্গা ব-দ্বীপের সমুদ্রবন্দরগুলিতে পৌঁছানোর পথও নিয়ন্ত্রণ করত। এই বন্দরগুলির সঙ্গে ব্রহ্মদেশের উপকূলের বাণিজ্য সম্পর্ক থাকায়, অঙ্গজয়ের ফলে অন্তর্বাণিজ্যের সঙ্গে বহির্বাণিজ্য যুক্ত হয়েছিল।

বিম্বিসার দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। গান্ধারের পুককুসতি তাঁর কাছে রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছিলেন। সুদূর মদ্রের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করার মধ্যেও এই নীতি পরিস্ফুট হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত নিকটে, অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁর চিকিৎসক জীবককে প্রদ্যোতের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

তাঁর রাজ্যের আয়তন ছিল ৩০০ লিগ (১ লিগ ৩১২ মাইল)। তাঁর রাজত্বকালে মগধ একটি বর্ধিষ্ণু রাজ্য ছিল। গিরিব্রজ-র নিকটে রাজগৃহ তিনি নির্মাণ করেন। মহাবীর জৈন এবং গৌতম বুদ্ধ উভয়েই তাঁর রাজত্বকালে স্ব স্ব ধর্মমত প্রচার করেন। বিম্বিসার বৌদ্ধ ধর্মমত গ্রহণ করলেও, জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এর পিছনে হয়তো তাঁর লিচ্ছবিবংশীয়া স্ত্রী চেল্লনার প্রভাব ছিল।

বিম্বিসার অঙ্গ ভিন্ন অপর কোন রাজ্য জয় করেন নি। আগেই বলা হয়েছে যে এই জয়ের পিছনে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করেছিল। সুতরাং তাঁকে যুদ্ধার্থী বলা যায় না। বরং তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় এবং একজন উত্তম সংগঠক। আযোগ্য কর্মচারীদের পদচ্যুত করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। তিনি গ্রামের মোড়লদের সঙ্গে মিলিত হতেন, রাজ্যপরিদর্শন করতেন। তাছাড়া, তিনি পথঘাট, বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণ করেন।

কিংবদন্তী অনুসারে চেল্লনার গর্ভজাত পুত্র অজাতশত্রুর হাতে তিনি নিহত হন। অবশ্য জৈন তথ্যাদিতে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় না।

৩ক.৪ অজাতশত্রু (খ্রিস্টপূর্ব ৪৯৩-৪৬২ অব্দ) কুণিক

সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে অজাতশত্রু চম্পার শাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে হর্যঙ্ক বংশের গৌরব উচ্চতম সীমা স্পর্শ করেছিল। তিনি শুধু কোশলকে পর্যুদস্ত করে স্থায়ীভাবে কাশী দখল করেছিলেন তাই নয়, তিনি বৈশালীকে কুক্ষিগত করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কোশলের স্থান ঠিক অঙ্গ-র মতো ছিল না। তার একটি সম্মানজনক স্থান ছিল। গৌতম বুদ্ধ কোশলের অধিবাসী ছিলেন। দুইটি মহাকাব্যের একটি, *রামায়ণ*-এর কাহিনী কোশলকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল। একসময় মনে হয়েছিল যে ভারতের ইতিহাসে যে ভূমিকা মগধ গ্রহণ করেছিল, সেই ভূমিকা কোশল গ্রহণ করবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই কোশল ও মগধের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। অজাতশত্রুর

রাজত্বকালে এই প্রচ্ছন্ন শত্রুতা প্রকাশ্য যুদ্ধের আকার ধারণ করেছিল। কোশলের অংশবিশেষ, কাশীগ্রাম, ইতিপূর্বে বিম্বিসারকে যৌতুক হিসাবে দেওয়া হয়েছিল।

মগধের সঙ্গে কোশলের এই যুদ্ধের আশু কারণ ছিল অজাতশত্রু কর্তৃক বিম্বিসারকে হত্যা করা। এর ফলে কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগ্নী বিধবা হয়ে স্বামীর শোকে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। প্রসেনজিৎ তখন কাশী সম্পর্কে পূর্ব ব্যবস্থা প্রত্যাহার করেন। এর ফলে যে যুদ্ধ শুরু হয় তাতে ফলাফল প্রথম দিকে অনিশ্চিত হলেও, তা শেষ পর্যন্ত অজাতশত্রুর অনুকূলে যায়। প্রসেনজিৎ তাঁর কন্যা বাজিরাকে অজাতশত্রুকে সমর্পণ এবং তাঁকে কাশী প্রত্যর্পণ করেন। প্রসেনজিৎ এইভাবে অজাতশত্রুর হাতে নিগৃহীত হন, কিন্তু অজাতশত্রু তাঁকে ধ্বংস করেন নি।

মগধ ও কোশলের মধ্যে এই মীমাংসাকে সাময়িক বলা যায়। কেননা, দ্রুত এই বিরোধ ব্যাপকতর আকার ধারণ করে এবং বৃহত্তর রাজনীতির অঙ্গীভূত হয়ে যায়। অজাতশত্রুর নামটা তাঁর পক্ষে ছিল নেহাৎ বেমানান। প্রকৃতপক্ষে তাঁর শত্রুর সংখ্যা ছিল অনেক। পূর্ব ভারতের ছত্রিশটি গণরাজ্যে তাঁর বিরুদ্ধে মিত্রসঙ্ঘ গঠন করছিল। সুতরাং প্রতিপক্ষ প্রবল ছিল। কাশী-কোশল এই সঙ্ঘে যোগদান করায় তা আরও প্রবলতর হয়েছিল। এই মিত্রসঙ্ঘের নেতা ছিলেন লিচ্ছবি বংশীয় নরপতি চেতক।

মিত্রসঙ্ঘের সঙ্গে মগধের এই বিরোধের অব্যবহিত কারণ সম্পর্কে জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। জৈন সাহিত্য অনুসারে বিম্বিসার বৈশালীর রাজা চেতকের কন্যা চেল্লনার দুই পুত্রকে যে মণিমুক্তা ও হস্তী দান করেন, সিংহাসন আরোহণের পর অজাতশত্রু সেই দান প্রত্যাহার করতে চাইলে এই বিরোধের সূত্রপাত হয়। বৌদ্ধ সাহিত্য অনুসারে লিচ্ছবিগণ খনি সম্পর্কিত একটি চুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করলে এই সংঘর্ষ শুরু হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মগধের সঙ্গে লিচ্ছবিদের এই সংগ্রামে গৌতম বুদ্ধের সহানুভূতি লিচ্ছবিদের পক্ষে ছিল। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে মগধের সঙ্গে কোশলের যুদ্ধ হয়তো দুইটি পৃথক ঘটনা ছিল না। সম্ভবত তারা ছিল মগধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের বিরুদ্ধে একই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দুইটি দিক।

এই যুদ্ধে সামরিক শক্তির যে ভূমিকা ছিল, যুদ্ধের কূটনীতির ভূমিকা তার চেয়ে কম ছিল না। এই কূটনীতির কেন্দ্রে ছিলেন অজাতশত্রুর মন্ত্রী বস্সাকর। তাঁর পরমার্শ অনুসারে মগধের গুপ্তচরেরা মিত্রসঙ্ঘের অভ্যন্তরীণ ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য বৈশালীর লিচ্ছবিদের মধ্যে তিন বৎসর সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছিল।

এই যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে অজাতশত্রু আরও একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। লিচ্ছবি গণরাজ্যটি ছিল গঙ্গা নদীর অপর তীরে। মগধের রাজধানী রাজগৃহ গঙ্গা থেকে অনেক দূরে অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত হওয়ায়, সেখান থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করা সুবিধাজনক ছিল না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য অজাতশত্রু গঙ্গাতীরে সুবিধাজনক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এইভাবে ভবিষ্যৎ পাটলিপুত্র নগরীর ভিত্তি স্থাপিত হয়। দুর্গনির্মাণে দুই বৎসর এবং মিত্রসঙ্ঘের ঐক্য বিনাশের জন্য তিন বৎসর লেগেছিল।

মিত্রসঙ্ঘ এমনিতেই খুব শক্তিশালী ছিল। দলনেতা চেতক, সিন্ধু-সৌবীর, বৎস এবং অবন্তী রাজ্যের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা সেই শক্তি আরও বৃদ্ধি করেছিলেন। সুতরাং দীর্ঘ ষোলো বছর ধরে (খ্রিস্টপূর্ব

৪৮৪-৪৬৮ অব্দ) এই যুদ্ধ চলেছিল। মগধের সেনাবাহিনী এই যুদ্ধে দুইটি গোপন এবং মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। এই অস্ত্র দুটি হল মহাশিলাকণ্টক এবং রথমুসল। প্রথমটির সাহায্যে প্রবল বেগে প্রস্তর নিক্ষেপ করা যেত, আর দ্বিতীয়টিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত ট্যাঙ্কের পূর্বসূরী বলা যায়।

বাসাম ১৯৫১ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে গঠিত একটি প্রবন্ধে "লিচ্ছবিদের সঙ্গে অজাতশত্রুর যুদ্ধকে" তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু করেছিলেন। এই আলোচনায় তিনি বিষয়টিকে শুধু গভীরতা দান করেছেন তাই নয়, তাকে একটি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, লিচ্ছবি মিত্রসঙ্ঘের সঙ্গে অজাতশত্রুর যুদ্ধ তৎকালীন ভারতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন বিবরণে তারতম্য আছে। তবে মূল কয়েকটি বিষয়ে দুইটি বিবরণ একই ধরনের।

তিনি বলেন যে, অজাতশত্রু প্রথম দিকে এই যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি যখন যুদ্ধের ফলাফল জানবার জন্য বস্সাকরকে বুদ্ধের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখন এ বিষয়ে তাঁর মনে অনিশ্চয়তা ছিল। গঙ্গা তীরে তিনি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন, তা ছিল আত্মরক্ষার জন্য, আক্রমণের জন্য নয়। *মহাপরিনিব্বাণ* সুত্ত-এর সংস্কৃত ভাষান্তর থেকে জানা যায় যে, বজ্জিদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে অজাতশত্রু তাদের সম্পর্কে "ব্যসনম" (অর্থাৎ ধ্বংস) এবং "ঋদ্ধমশ্চ স্ফীতম" (অর্থাৎ ধনী এবং সমৃদ্ধিশালী) শব্দগুলি প্রয়োগ করেছিলেন। সুতরাং এই যুদ্ধ অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

জৈন গ্রন্থাদিতে বলা হয়েছে যে নয় জন লিচ্ছবি, নয় জন মল্লকি এবং আঠারো জন কাশী-কোশলের উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে গঠিত মিত্রসঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন। নয় জন লিচ্ছবি নরপতি এবং নয় জন মল্লকি (অর্থাৎ মল্ল) সম্পর্কে বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। কিন্তু কাশী-কোশলের আঠারো জন উপজাতীয় নরপতি কোথা থেকে এলেন, সে প্রশ্ন থেকে যায়। কেননা, বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে মগধের সঙ্গে কোশলের যুদ্ধ শেষ হলে প্রসেনজিতের পুত্র বীরূবাহ রাজা হয়েছিলেন এবং বজ্জিদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই প্রসেনজিতের মৃত্যু হয়েছিল। সুতরাং এই যুদ্ধের আগে কাশী-কোশল প্রসেনজিতের অধিকারে ছিল। তাহলে আঠারো জন উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ কখন কাশী-কোশল শাসন করলেন? বাসাম তাঁদের আবির্ভাবের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, কাশী-কোশলের এই আঠারো জন গণরাজার সঙ্গে বীরূবাহ কর্তৃক শাক্যদের ধ্বংসসাধন এবং তার অল্পকাল পরে তাঁর মৃত্যু হয়তো জড়িত। বীরূবাহ তাঁর রাজ্যের উত্তরে এবং পূর্বে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য শাক্যদের আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর এই আক্রমণ স্বাভাবিকভাবেই, অন্য যে সকল উপজাতি কোশলকে কর দিত, তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। মল্লগণ সেই উপজাতিদের অন্যতম ছিল। এমনও হতে পারে যে, বীরূবাহের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে, সেই অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী গণরাজ্যের পক্ষে যোগ দিয়েছিল। এটি ছিল বৈশালীর বজ্জি অথবা লিচ্ছবি গণরাজ্য। কাশী-কোশলের এই আঠারো জন উপজাতীয় নৃপতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উপজাতির নেতা ছিলেন। প্রথম দিকে তাঁরা কোশল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এইভাবে গঙ্গার উত্তর তীরস্থ বিভিন্ন উপজাতি কোশল এবং মগধের নতুন শাসকদের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যলিপ্সায় শঙ্কিত এবং তাদের স্বতন্ত্র সংবিধান এবং জীবনযাপন পদ্ধতি রক্ষায় দৃঢ়সংকল্প হয়ে, একটি বৃহৎ মিত্রসঙ্ঘ গঠন করেছিল।

বিম্বিসার এবং অজাতশত্রু তাঁদের সমগ্র রাজত্বকালে গঙ্গার উপর যতদূর সম্ভব আধিপত্য বিস্তারের যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন, মগধের সঙ্গে লিচ্ছবিদের যুদ্ধ তারই একটি অংশ বলা যায়। বাসাম বলেছেন যে, পরবর্তীকালে সমুদ্রগুপ্ত, শশাঙ্ক এবং ধর্মপালের রাজ্যজয়ের পিছনেও একই উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। বিম্বিসার ইতিপূর্বে সমৃদ্ধ নদীবন্দর চম্পা সহ সমগ্র অঙ্গ রাজ্য মগধের অন্তর্ভুক্ত করেন। পালি গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে চম্পার ব্যাপক বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। দক্ষিণ ভারতের মণিমুক্তা এবং মসলা চম্পা বন্দর হয়ে সমগ্র উত্তর ভারতে যেত। বাসাম বলেছেন যে, এই অঙ্গ-জয়কে মগধের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়। চম্পার বাণিজ্য সম্পদ একদিকে বিম্বিসারের রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংহতি বিধান এবং অন্যদিকে অজাতশত্রুর আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে সম্ভব করেছিল। কোসল যুদ্ধের ফলে গঙ্গার বিস্তৃত অঞ্চলে এবং লিচ্ছবি যুদ্ধের ফলে গঙ্গার উত্তর তীরে মগধের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইভাবে গঙ্গার উভয় তীর অজাতশত্রু মগধের নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন। বৌদ্ধ কাহিনী অনুসারে একটি নদী-বন্দর সম্পর্কিত বিতর্ককে কেন্দ্র করে মগধের সঙ্গে লিচ্ছবিদের যুদ্ধ হয়েছিল। বাসাম মনে করেন যে, এই কাহিনী তাৎপর্যপূর্ণ।

বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর রাজত্বকালে মগধ ভারতের পূর্বতন রাষ্ট্রচিন্তাকে অতিক্রম করেছিল। বাসাম মনে করেন যে, এর পিছনে হয়তো পাশ্চাত্যের প্রেরণা ছিল। বিম্বিসার যখন তরুণ, তখন পারস্য সম্রাট কাইরাস (কুরু) পৃথিবীতে বৃহত্তম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অজাতশত্রু সিংহাসন আরোহণের পূর্বে পারসিকগণ সিন্ধুনদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল এবং হয়তো তক্ষশিলা অধিকার করেছিল। তক্ষশিলার শাসক পুক্কুসতির সঙ্গে বিম্বিসার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। মগধ থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্য পথ ছিল। গঙ্গা উপত্যকা থেকে উচ্চবর্ণের মানুষ তাঁদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য তক্ষশিলায় যেতেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিম্বিসার ও অজাতশত্রু অবশ্যই সচেতন ছিলেন। নূতন সম্পদের অধিকারী হয়ে, তাঁরা হয়তো পারস্যের দৃষ্টান্ত থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

লিচ্ছবিদের সঙ্গে যুদ্ধে অজাতশত্রু জয়ী হয়েছিলেন। এর ফলে সমগ্র উত্তর বিহার মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সমগ্র পূর্বভারতে অজাতশত্রুর একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈশালীর নগর-রাষ্ট্র তার স্বাধীনতা হারায়। অবশ্য লিচ্ছবিদের পৃথক অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

অজাতশত্রুর এই সাফল্য অবন্তীরাজ প্রদ্যোত প্রসন্ন মনে নিতে পারেন নি। তিনি রাজগৃহ আক্রমণ করবেন, এমন সম্ভাবনাও দেখা যায়। অজাতশত্রু তাই রাজগৃহের রক্ষাব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করেন। অবশ্য প্রদ্যোতের এই মনোভাব কার্যত কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। অজাতশত্রু কোশলকে পর্যুদস্ত করে এবং কাশী ও বৈশালী অধিকার করে তাঁর রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত করেন। এইভাবে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর তিনি মগধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাসাম বলেছেন যে, বিম্বিসার এবং অজাতশত্রু একটি নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করেছিলেন। সেই নীতিটি ছিল গঙ্গার গতিপথের যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করা। তাঁরা দুজনেই একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের কথা ভেবেছিলেন। অজাতশত্রু যত বড় সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন, তখন পর্যন্ত অপর কোন শাসক তা করেছিলেন বলে জানা নেই। বারাণসী থেকে বঙ্গদেশের সীমান্ত পর্যন্ত গঙ্গার উভয় তীর তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল।

বিম্বিসারের মতো অজাতশত্রু সম্পর্কেও জৈন এবং বৌদ্ধগণ একই দাবি করেছেন। বুদ্ধের সঙ্গে অজাতশত্রুর প্রথমে বৈরী সম্পর্ক থাকলেও, পরে সেই সম্পর্ক বিশেষ আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ হয়েছিল। তিনি বুদ্ধ সন্দর্শনে

গিয়েছিলেন। ভারহুতে অন্যতম ভাস্কর্যে সেই স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে। রাজধানীর চারদিকে তিনি ধানুচৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। রাজগৃহে অনেকগুলি মহাবিহার সংস্কার করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বৌদ্ধ সঙ্গীতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অজাতশত্রুর পর চার জন রাজা উদয়ভদ্র বা উদয়িন, অনুরুদ্ধ, মন্দ্র এবং নাগদশক, একের পর এক মগধের সিংহাসনে বসেন। সমষ্টিগতভাবে তাঁদের রাজত্বকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৪৬২ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০ অব্দ পর্যন্ত। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে অজাতশত্রুর উত্তরাধিকারী ছিলেন দর্শক। কিন্তু এই ধারনা ভ্রান্ত মনে হয়। কেননা, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য এ-বিষয়ে একমত যে অজাতশত্রুর উত্তরাধিকারী ছিলেন উদয়িন। *স্বপ্নবাসবদত্তা*-য় দর্শকের উল্লেখ আছে। ডঃ ভাণ্ডারকরের মতে এই দর্শক ছিলেন হর্যঙ্ক বংশের শেষ প্রতিনিধি, নাগদশক।

মগধের রাজ্যসীমা ইতিমধ্যে বহুদূর বিস্তার লাভ করেছিল। দক্ষিণ বিহারের সঙ্গে উত্তর বিহার যুক্ত হয়েছিল। এর ফলে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিগ্রামে দুর্গ নির্মাণ করে অজাতশত্রু এই ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ামকে কেন্দ্র করে কলকাতা নগরীর মতো পাটলিগ্রামের সেই দুর্গের ছায়ায় পাটলিপুত্র প্রতিষ্ঠা তাই উদয়িনের জীবনের সর্বোত্তম কীর্তি।

উদয়িন যখন সিংহাসনে আসেন, তার আগেই অঙ্গ, কোশল এবং বজ্জি মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। উত্তর ভারতে বাকি ছিল শুধু অবন্তী। অবন্তীর রাজা প্রদ্যোতের রাজগৃহ আক্রমণের আশঙ্কায় তিনি আত্মরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করতে বাধ্য হন। উদয়িনের সময় অবন্তীর রাজা ছিলেন প্রদ্যোতের পুত্র পালক। ইতিমধ্যে অবন্তী পূর্ব ভারতের সবকটি রাজ্য ও গণরাজ্য জয় করে নেওয়ায়, তার শক্তি বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। *কথাসরিৎসাগর* অনুসারে কৌশাম্বী রাজ্যটিও পালক অবন্তী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এইভাবে মগধ ও অবন্তী পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে দুইটি রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত অজাতশত্রুর রাজত্বকালেই ঘটেছিল। উদয়িনের সময় এই সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল, এই পর্যন্ত। কিংবা বলা যায় যে, এতদিন যে বিরোধ প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল, উদয়িনের রাজত্বকালেই তা প্রকাশ্য যুদ্ধের আকার ধারণ করেছিল। অবন্তী অন্তর্বিপ্লবের ফলে জীর্ণ ও দুর্বল হওয়ার প্রথম দিকে এই যুদ্ধের ফলাফল মগধের অনুকূলে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা উদয়িনের রাজত্বকালে হয়নি। জৈন ঐতিহ্য থেকে মনে হয় যে শিশুনাগ অথবা মহাপদ্মনন্দের সময় এই প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছিল।

উদয়িন ছিলেন একজন একনিষ্ঠ জৈন। পাটলিপুত্র নগরীর কেন্দ্রস্থলে তিনি একটি জৈন চৈত্যগৃহ নির্মাণ করেছিলেন।

উদয়িনের বংশধরেরা সকলেই দুর্বল ছিলেন। তাছাড়া, সিংহলী ইতিবৃত্ত অনুসারে তাঁরা সকলেই ছিলেন পিতৃঘাতী, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাই তাঁদের শাসনকালে সাময়িকভাবে মগধের অবনতি ঘটেছিল। অবশ্য মগধের এই দুর্গতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। শাসকদের চরিত্র এবং ব্যর্থতা গণমানসে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থায় অমাত্য শিশুনাগ সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যহার করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। এইভাবে অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফলে মগধের হর্যঙ্ক বংশের উচ্ছেদ এবং শৈশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

শিশুনাগ এবং তাঁর পুত্র কালাশোক (অথবা কাকবর্ণ) শৈশুনাগ বংশের দুইজন শাসক। মিলিতভাবে তাঁর রাজত্বকালে খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০-৩৬৪ অব্দ পর্যন্ত।

মহাবংশটীকা অনুসারে শিশুনাগের পিতা ছিলেন বৈশালীর লিচ্ছবি বংশের জনৈক রাজা, আর মা ছিলেন একজন নগরশোভিনী। পুরাণে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি অবন্তীর প্রদ্যোত রাজবংশের গৌরব হরণ করেছিলেন। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এমন মনে করবার কারণ আছে যে অবন্তীরাজ নালকের সময় যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল, তাঁর মৃত্যুর পরে বিশাখা এবং আর্যক-এর সময়ও তার অবসান হয়নি। অবন্তীর এই দুর্বলতা নিঃসন্দেহে শিশুনাগকে উৎসাহিত ও সাহায্য করেছিল। শিশুনাগ মগধের রাজধানী সাময়িকভাবে গিরিব্রজে এবং পরে পাকাপাকিভাবে বৈশালীতে স্থানান্তরিত করেন। মনে হয় অবন্তীর বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই তিনি গিরিব্রজে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বৈশালী সম্পর্কে তাঁর মানসিক দুর্বলতার কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে।

শিশুনাগের পর যিনি মগধের সিংহাসনে বসেন বৌদ্ধ সাহিত্যে তিনি কালাশোক এবং পুরাণে কাকবর্ণ নামে পরিচিত। তাঁর রাজত্বকালের দুইটি ঘটনা স্মরণীয়। প্রথমত, তিনি মগধের রাজধানী পুনরায় পাটলিপুত্রে নিয়ে আসেন এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর রাজত্বকালে বৈশালীতে বৌদ্ধ সঙ্গীতির দ্বিতীয় অধিবেশন আহূত হয়। বাণভট্ট এবং কার্টিয়াসের রচনা থেকে জানা যায় যে, তিনি নিহত হয়েছিলেন। খুব সম্ভবত এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিলেন, নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্মনন্দ। এইভাবে রক্তপাতের মধ্য দিয়ে শিশুনাগ বংশের সূচনা এবং অবসান হয়েছিল। স্বার্থের সমাপ্তি ঘটেছিল অপঘাতে।

৩ক.৫ নন্দবংশ (খ্রিস্টপূর্ব ৩৬৪-৩২৪ অব্দ)

পুরাণ অনুসারে নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহাপদ্ম, *মহাবংশটিকা* অনুসারে উগ্রসেনা। এই দ্বিতীয় নামটি মনে রাখলে, নন্দবংশের শেষ শাসক ধননন্দকে গ্রীক লেখকগণ কেন আগ্রামেস নামে অভিহিত করেছেন, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ধননন্দ উগ্রসেনার পুত্র, সেই হেতু, তিনি ঔগ্রসৈন্য। গ্রীক লেখকদের কাছে ঔগ্রসৈনের বিকৃত রূপ আগ্রামস।

মহাপদ্মনন্দের বংশপরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। পুরাণ অনুসারে তাঁর পিতা ছিলেন শৈশুনাগ বংশের শেষ শাসক এবং মাতা জনৈকা শূদ্রা রমণী। জৈন *পরিশিষ্টপর্বণ* অনুসারে, নাপিতের ঔরসে কুলটা রমণীর গর্ভে তাঁর জন্ম। কার্টিয়াসের রচনায় এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর পিতৃমাতৃ পরিচয় যাই হোক না কেন, তিনি যে হীন বংশজাত ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মহাপদ্মের এই হীন জন্ম ঐতিহাসিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বারা প্রাচীন ভারতের রাজনীতিতে চিরাচরিত ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের সমাপ্তি সূচিত হয়েছিল। বলা যায় যে প্রতিবাদী মনোভাব ধর্মের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সৃষ্টি করেছিল, সেই একই মনোভাব মহাপদ্মের পক্ষে মগধের সিংহাসন লাভ সম্ভব করেছিল। অন্যভাবে বলা যায় যে ধর্ম ও রাজনীতি তখন পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলছিল।

ঐতিহ্য অনুসারে নন্দবংশীয় রাজাদের সংখ্যা ছিল নয়। পুরাণ অনুসারে মহাপদ্ম ছিলেন পিতা, আর অন্য

আটজন তাঁর পুত্র। বৌদ্ধ সাহিত্য অনুসারে এঁরা ছিলেন ভাই। এই নবনন্দ-এর মধ্যে শুধু প্রথম মহাপদ্ম এবং শেষ ধননন্দের কথা জানা যায়।

হীন বংশোদ্ভূত হলেও মহাপদ্ম অশেষ শক্তির অধিকারী ছিলেন। পুরাণে তাঁকে 'দ্বিতীয় পরশুরাম', 'সর্বক্ষত্রান্তক' এবং 'একরাট' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তিনি যে ক্ষত্রিয় বংশগুলির উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন, সেগুলি ছিল ইক্ষ্বাকু, পাঞ্চাল, কাশী, হৈহয়, কলিঙ্গ অস্মক, কুরু, মৈথিল, সুরসেন এবং বিতিহোত্র। ঐতিহাসিক অন্য উপাদান থেকেও পৌরাণিক বক্তব্যের আংশিক সমর্থন পাওয়া যায়। *কথাসরিৎসাগর*-এ কোশলের অন্তর্গত অযোধ্যায় মহাপদ্মের সামরিক ছাউনির উল্লেখ আছে। এ থেকে মনে হয় যে কোশলের ইক্ষ্বাকু অঞ্চল তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতিগুম্ফা লেখতে একটি কৃত্রিম জলপ্রণালী প্রসঙ্গে নন্দরাজের নামোল্লেখ আছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে মহাপদ্ম কলিঙ্গ জয় করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে গোদাবরী তীরে "নব নন্দ ডেহরা" আবিষ্কার থেকে মনে হয় যে দক্ষিণ ভারতের অংশবিশেষের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর মহীশূরের একটি লেখ, কুন্তলের (বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণ এবং মহীশূরের উত্তর-পশ্চিম অংশ) উপর তাঁর প্রভুত্বের আভাস দেয়। কিন্তু এই লেখ অনেক পরবর্তীকালে হওয়ায়, এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, কলিঙ্গ জয়ের পর তিনি যে অস্মক এবং আরও দক্ষিণস্থ অঞ্চল জয় করেন নি, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। সর্বোপরি প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনায় পুরাণের বক্তব্য সমর্থিত হয়। তাঁরা লিখেছেন যে আলেকজান্ডার যখন উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করেন, তখন বিপাশা নদীর অপর তীরের শক্তিশালী মানুষেরা এমন একজন রাজার অধীনে বাস করত, যাঁর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। এই রাজা অবশ্যই ছিলেন নন্দবংশের শাসক ধননন্দ। মহাপদ্মনন্দের এই বিস্তৃত রাজ্যজয় স্মরণে রেখে ডঃ রায়চৌধুরী তাঁকে ঐতিহাসিক যুগে ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন।

ধননন্দ আলেকজান্ডারের সমসাময়িক ছিলেন। গ্রীক লেখকদের কাছে তিনি ছিলেন 'আগ্রামেস'। তিনি শক্তিশালী শাসক ছিলেন। গ্রীক লেখকদের কাছ থেকে জানা যায় যে তাঁর ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২০০০ পদাতিক, ২০০০ রথ এবং ৩০০০ হাতি ছিল। গঙ্গাহৃদি এবং প্রাসি (Gangaridae and Prasi) তাঁর শাসনাধীন ছিল। মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে 'গঙ্গাহৃদি' বলতে গঙ্গা নদীর ব-দ্বীপস্থ অধিবাসীদের বোঝাত এবং 'প্রাসী' বলতে প্রাচ্যগণ অর্থাৎ পঞ্চাল, সুরসেনা কোশল-কাশী ও বিদেহ'র অধিবাসীবৃন্দদের বোঝাত। বিপুল সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার বহনের জন্য তাঁকে অত্যধিক কর আদায় করতে হত। সাধারণের প্রতি তার ব্যবহারও মোটেই ভাল ছিল না। এর ফলে জনগণমনে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত এই বিক্ষোভের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তক্ষশিলার ব্রাহ্মণ কৌটিল্যের সাহায্যে নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন।

নন্দরাজগণ একটি বৃহৎ মগধরাজ্য অধিকারের পর বিভিন্ন দিকে এর সীমা সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা একটি বৃহৎ সৈন্যদল গঠন করেছিলেন। গ্রীকদের লেখায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। আলেকজান্ডার তাঁর রাজ্যজয়ে পাঞ্জাব অতিক্রম না করায় তাঁরা এই সৈন্যদলকে বিদেশীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সুযোগ পাননি। তবুও অনুমান করা যায় যে, বিদেশীদের আক্রমণ তাঁদের রাজ্যের সংহতিসাধনে সহায়তা করেছিল।

তাঁদের রাজত্বকালে ভূমিকর রাজস্বের একটি প্রধান উৎস রূপে পরিগণিত হয়েছিল। তখন জমি খুব উর্বর থাকায় এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ খুব বেশি হওয়ায়, ভূমিকরের হার খুব উচ্চ ছিল। নিয়মিত কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে এই কর আদায় করা, তাঁদের শাসনব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইভাবে রাজকোষে প্রচুর অর্থাগম হত। নন্দদের ধনসম্পদ তাই প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। জলসেচের জন্য খাল খনন করে তাঁরা কৃষির উন্নতি বিধানে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। প্রধানত কৃষি-অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল একটি সাম্রাজ্য গঠনের চিন্তা তখন ভারতীয় মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জন্য নন্দ রাজাদের এই চিন্তা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। মৌর্যযুগে এই সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। এ দিক দিয়ে বিচার করলে মৌর্যবংশকে নন্দবংশের উত্তরসাধক বলা যায়।

৩ক.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

১। মহাজনপদ কাকে বলে ও তার অবস্থান কোথায় ছিল?

২। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে প্রধান প্রধান মহাজনপদগুলির নাম উল্লেখ করুন।

৩। মগধে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। মগধে সাম্রাজ্য বিকাশের পিছনে অজাতশত্রু ও মহাপদ্মনন্দের অবদান আলোচনা করুন।

৩ক.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। এইচ. সি. রায়চৌধুরী : *পলিটিকাল হিস্ট্রী অফ্ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া (১৯৭২)*

২। রোমিলা থাপার : *এ হিস্ট্রী অফ্ ইন্ডিয়া (১৯৬৮)*

৩। ডি. এন. ঝাঁ : *এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া ইন হিসটোরিক্যাল আউটলাইন (১৯৯৭)*

৪। বিজয় কুমার ঠাকুর : *আন্নবানাইজেশন ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া (১৯৬১)*

একক ৩খ ❑ মৌর্য সাম্রাজ্য ঃ সম্প্রসারণ, বিস্তৃতি, শাসনব্যবস্থা ও পতন

গঠন

৩খ.০ উদ্দেশ্য

৩খ.১ প্রস্তাবনা

৩খ.২ মৌর্যযুগ ঃ চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার

৩খ.২.১ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা ঃ মেগাস্থিনিস

৩খ.২.২ চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা ঃ অর্থশাস্ত্র

৩খ.২.৩ ভূমি রাজস্ব এবং রাজস্ব ব্যবস্থা

৩খ.৩ বিন্দুসার (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-২৭৩ অব্দ)

৩খ.৪ অশোক (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ)

৩খ.৪.১ কলিঙ্গ যুদ্ধ

৩খ.৪.২ অশোকের রাজ্যসীমা

৩খ.৪.৩ অশোকের শাসনব্যবস্থা

৩খ.৪.৪ অশোকের ধম্ম

৩খ.৫ অশোকের পরবর্তী মৌর্যগণ ও মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন

৩খ.৫.১ মৌর্য সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন

৩খ.৬ অনুশীলনী

৩খ.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩খ.১ প্রস্তাবনা

এই এককের জন্য আলোচিত হবে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কীভাবে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজান্ডারের সেনাপতিদের পরাজিত করে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন। এই প্রসঙ্গে আরও জানতে পারবেন চন্দ্রগুপ্তের আমলে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও তার শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্যের বিবরণ থেকে মৌর্য শাসনব্যবস্থার সম্বন্ধে যে পর্যালোচনা পাওয়া যায় তাও এই এককের মাধ্যমে জানতে পারবেন।

বিন্দুসারের রাজত্বকালের পর মৌর্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন মৌর্য তথা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এক

বিখ্যাত সম্রাট—অশোক। কলিঙ্গ বিজয়ের পর তিনি আক্রমণাত্মক যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে নতুন এক ধর্মে দীক্ষিত হন। অশোকের এই ধর্মীয় পরিবর্তন তাঁর রাষ্ট্রনীতি এবং অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে আপনি আরও জানতে পারবেন অশোকের ধম্ম কবে এবং কেন প্রচারিত হয়েছিল, আর তার স্বরূপই বা কী ছিল, এবং এই বৌদ্ধধর্মের সমার্থক বলা যায় কি না।

সবশেষে আপনি জানবেন অশোকের পরবর্তী মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের নানা কারণ।

৩খ.২ মৌর্য যুগ ঃ চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে, মৌর্যদের আবির্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

চন্দ্রগুপ্ত (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪-৩০০ অব্দ) এক যুগসন্ধিক্ষণে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাকে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। তাঁর পূর্বে নন্দরাজগণ দ্বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। একদিকে ছিল জনগণের অসন্তোষ এবং অন্যদিকে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে বিদেশীদের অধিকার বিস্তার। সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দায়িত্ব ছিল বৃহৎ এবং বিবিধ। প্রথমত, জায়মান মগধ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা ও তার সম্প্রসারণ ঘটানো। দ্বিতীয়ত, কার্যকরভাবে বিদেশী শত্রুর মোকাবিলা করা। তৃতীয়ত, বিক্ষিপ্ত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে, ভারতের রাজনীতিতে রাজচক্রবর্তী আদর্শের পুনরুজ্জীবন ঘটানো। চতুর্থত, বিচিত্র কর্মপ্রবাহের মধ্যে আত্মনিয়োগ করে অজস্র চরিতার্থতা লাভের জন্য ভারতীয়দের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করা এবং পঞ্চমত সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে ভারত এবং বহির্জগতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা। ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তখন ভারতের ইতিহাসে একজন বীরপুরুষের প্রয়োজন ছিল এবং চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন সেই আকাঙ্ক্ষিত বীর।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসনে আরোহণের সঠিক তারিখ সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ আছে। সাধারণত চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণের যে তারিখটি পাওয়া যায়, সেটি খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫-৩২৪ অব্দ।

ভারতীয় লেখকগণ চন্দ্রগুপ্তের বংশপরিচয় সম্পর্কে কোন সর্বসম্মত ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করেন নি। তাই এটিও বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। বংশের নাম যে মৌর্য এ বিষয়ে সকলে একমত। বৌদ্ধ লেখকগণ 'মৌর্য' শব্দটি একটি গোষ্ঠীর নাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এবং এই গোষ্ঠী বুদ্ধের সময় থেকে ক্ষত্রিয়রূপে পরিচিত ছিল। *মহাপরিনিব্বাসুত্ত*-এ এর অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে আছে যে, বুদ্ধের মৃত্যুর পর যেসব গোষ্ঠী তাঁর দেহাবশেষ সংগ্রহের জন্য এসেছিল তাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় মোরিয়গণও ছিল। তারা ছিল গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত পিপ্পালিবনের একটি ক্ষুদ্র গণরাজ্যের শাসক। ঐতিহাসিকেরা এখন এ বিষয়ে একমত যে, এই মোরিয়গণই মৌর্যদের পূর্বসূরী।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জন্য ঐতিহাসিক উপাদান বহু এবং বিচিত্র। এই উপাদান প্রধানত সাহিত্য হলেও, অশোকের লেখ ছাড়াও মহীশূরলেখ এবং শক ক্ষত্রপ রুদ্রমানদের জুনাগড় স্তম্ভলেখ চন্দ্রগুপ্তের জন্য প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক উপাদানরূপে স্বীকৃত।

চন্দ্রগুপ্তের জন্য আমরা বিদেশী সাহিত্যের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। এই সাহিত্য না থাকলে চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে আমাদের অনেক ধারণা অস্পষ্ট থেকে যেত। ভারতের ইতিহাসে কালানুক্রমিক বিবরণের সূচনা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন আরোহণের তারিখ থেকে। এই তারিখটির সন্ধান বিদেশীদের লেখায় পাওয়া গেছে। সুতরাং বলা যায় যে, তাঁরাই আমাদের কালানুক্রমিক ইতিহাসের সূচনা করেছেন।

বিদেশী লেখকদের মধ্যে আলেকজান্ডারের তিনজন সঙ্গীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা ছিলেন নিয়ারকাস্ ওনেসিক্রিটাস ও এরিসটোবুলাস।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মেগাস্থিনিসের রচনাকে এঁদের লেখার পরিপূরক বলা যায়। মেগাস্থিনিসের মূল গ্রন্থ *ইন্ডিকা* পাওয়া যায়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক লেখকের রচনায় মেগাস্থিনিস থেকে বহুল উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। এই লেখকদের মধ্যে স্ট্রাবো, ডায়োডোরাস, প্লিনি, এ্যারিয়ান, প্লুটার্ক এবং জাস্টিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিদেশী সাহিত্য ছাড়া, ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য চন্দ্রগুপ্তের জীবন ও সময়কে আলোকিত করে। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য বলতে প্রধানত পুরাণ, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র,* বিশাখাদত্তের *মুদ্রারাক্ষস* এবং অংশত সোমদেবের *কথাসরিৎসাগর* এবং ক্ষেমেন্দ্রের *বৃহৎকথামঞ্জরী* বোঝায়। বৌদ্ধ সাহিত্য হল প্রধানত *দীপবংশ, মহাবংশ, মহাবংশটিকা* এবং *মহাবোধিবংশ*। জৈন গ্রন্থাদির মধ্যে ভদ্রবাহু রচিত *জৈন কল্পসূত্র* এবং হেমচন্দ্র রচিত *জৈনপরিশিষ্ট পর্বণ* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে তামিল সাহিত্যের কথাও স্মরণীয়। প্রাচীন তামিল লেখক মামুলনারের রচনায় বারংবার মৌর্যদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দের জুন মাসে। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক আবস্থা তখন কোন সাহসী, দুরদৃষ্টি ও সংগঠন শক্তিসম্পন্ন নেতার পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল।

গাঙ্গেয় অঞ্চল তখন দুটি সুনির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত ছিল। সমসাময়িক গ্রীক লেখকেরা এই দুটি অংশের নাম দিয়েছিলেন প্রাসি এবং গঙ্গাহৃদি। প্রাসি বলতে বোঝাত বর্তমান বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং হয়তো গঙ্গার দক্ষিণস্থ কিছু অঞ্চল। গঙ্গাহৃদি বলতে বোঝাত গঙ্গার ব-দ্বীপ অঞ্চল। আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময় এবং তার অব্যবহিত পরে এই দুইটি অঞ্চল নন্দদের একচ্ছত্র শাসনাধীনে ছিল। অর্থাৎ উত্তর ভারতের একটি বৃহৎ অংশের উপর নন্দরাজবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নন্দরাজগণ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন এবং বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। প্লুটার্ক লিখেছেন যে পুরুর সৈন্যদলের দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে ম্যাসিডনের সেনাবাহিনীর মনে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল এবং আগ্রামেসের দুর্ধর্ষ সৈন্যদলের কথা শুনে তারা আর অগ্রসর হতে সাহস পায়নি। এই আপাত জাঁকজমকের অন্তরালে নন্দ সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল বিশেষ দুর্বল। এর পিছনে জনগণের প্রকৃত সমর্থন ও আনুগত্য ছিল না। গ্রীক লেখকগণ লিখেছেন যে, আগ্রামেসের উদ্ধত আচরণ, অতিরিক্ত করভার এবং হীন জন্ম মানুষের মনে এমন বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। কোন উচ্চাভিলাষী এবং দুঃসাহসিক ব্যক্তি সেই বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে সমগ্র সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে পারত।

আলেকজান্ডারের সময় উত্তর-পশ্চিম ভারত বা উত্তরাপথ অনেকগুলি রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র শাসিত রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও সংঘর্ষের জন্য, তাদের পক্ষে আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে

মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ আলেকজান্ডারকে সাহায্য করেছিল। আলেকজান্ডার যে সহজেই উত্তর-পশ্চিম ভারত জয় করতে পেরেছিলেন, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা এইখানে। আলেকজান্ডার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি জয় করেছিলেন এবং তাদের পরিবর্তে কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছিলেন। এর ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের জটিলতা দূর হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের অঞ্চলসমূহের পুনর্বণ্টনও তিনি করেছিলেন। ঝিলাম নদীর পূর্বদিকের পাঞ্জাব দিয়েছিলেন পুরুকে। সিন্ধু ও ঝিলামের মধ্যবর্তী ভূভাগ শাসনের ভার পেয়েছিলেন তক্ষশিলার অম্ভি, মোটামুটিভাবে উত্তর পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরের শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন আবিসারেস। সিন্ধুদেশে নদীগুলির সঙ্গমস্থলের নিচের অংশের দায়িত্ব পেয়েছিলেন পেইথন। পঞ্চনদের সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন ফিলিপ্পস। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দের অক্টোবরে আলেকজান্ডার ভারত ত্যাগ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪ অব্দে ভাড়াটে গ্রীক সৈন্যদের হাতে ফিলিপ্পস নিহত হন এবং তাঁর জায়গায় আসেন ইউডামাস। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দের জুন মাসে আলেকজান্ডারও মারা যান।

আলেকজান্ডারের মৃত্যুসংবাদ ভারতে পৌঁছানো মাত্র এখানে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং ভারতীয়গণ তাঁদের পূর্ব প্রতিপত্তি ও গৌরব দ্রুত ফিরে পেতে সচেষ্ট হন। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে এবং অল্পকাল পরে সেখানে ক্ষমতার শূন্যতার সৃষ্টি করে আলেকজান্ডার সেখানে মৌর্য সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের পথ প্রস্তুত করেছিলেন। এদিকে লক্ষ্য রেখে ডঃ রায়চৌধুরী মন্তব্য করেছেন যে, যদি উগ্রসেন মহাপদ্মকে পূর্ব ভারতে মৌর্যসাম্রাজ্যের অগ্রদূত বলা যায়, তাহলে আলেকজান্ডার ছিলেন উত্তর-পশ্চিম ভারতে সেই সাম্রাজ্যের পূর্বসূরী। নন্দবংশ মানুষের মনে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ সৃষ্টি করে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ের পথ প্রস্তুত করেছিল এবং বিস্তৃত মগধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে মৌর্য সাম্রাজ্যের আংশিক খসড়া রচনা করেছিলেন। এইভাবে দেখা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যখন সিংহাসনে বসেছিলেন, তখন কী উত্তরাপথে, কী মধ্যদেশে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষভাবে তাঁর অনুকূলে ছিল। তাঁর কাজ কঠিন ছিল, কিন্তু বোধহয় অসম্ভব ছিল না।

চন্দ্রগুপ্ত কীভাবে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন, তার কোন সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায়নি। এজন্য আমাদের পরবর্তীকালের উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন লেখকেরা এ সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন। মিলিন্দ পঞ্হ-তে এই ঘটনাকে মৌর্যদের সঙ্গে নন্দদের যুদ্ধরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। জাস্টিনের রচনায় যেমন চাণক্যের গৌরবের কাছে চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব ম্লান হয়ে গেছে, মিলিন্দ পঞ্হ-তে তা হয়নি। কিন্তু পুরাণে, সিংহলী ইতিবৃত্তে এবং কামন্দকের *নীতিশাস্ত্র*-এ ব্রাহ্মণ চাণক্যকে সকল গৌরবের অধিকারী করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ (অথবা নবম) শতাব্দীর নাটক *মুদ্রারাক্ষস*-এও তাই।

নন্দবংশের শাসন দুই দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছিল। একদিকে এই রাজবংশ জনগণের সদিচ্ছা লাভ করতে পারেনি, অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা অথবা নীতি উদ্ভাবন করতে পারেনি। তাই এই বংশের উচ্ছেদকে মগধের এবং ভারতের ইতিহাসে একটি বাঞ্ছিত পদক্ষেপ বলা চলে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজান্ডারের সেনাপতিদের পরাজিত করে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় কৃতিত্ব। এ বিষয়ে জাস্টিন লিখেছেন যে, আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতিদের

হত্যা করে স্বাধীনতার সৃষ্টি করেছিলেন স্যানড্রাকোটাস বা চন্দ্রগুপ্ত। এই স্বাধীনতা যুদ্ধ ঠিক কখন শুরু ও শেষ হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। মনে হয় খ্রিস্টপূর্ব ৩১৭ অব্দের পূর্বে এই যুদ্ধ শেষ হয়নি।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের শেষভাগে সেলুকাসের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। সেলুকাস ছিলেন ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপের সেনাপতি এ্যান্টিওকসের পুত্র। তিনি প্রথম দিকে আলেকজান্ডারের সেনাপতি ছিলেন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পূর্ব সাম্রাজ্য শাসনের অধিকার লাভ করেন। পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তিনি ব্যাবিলন এবং ব্যাকট্রিয়া জয় করেন এবং পরে ভারতে আলেকজান্ডারের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি ভারত আক্রমণ করেন। এ্যাপ্পিয়ানের লেখা থেকে মনে হয় যে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলুকাসের সংঘর্ষের পূর্বে সিন্ধুনদ উভয়ের রাজ্যের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল।

প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনায় এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তাই এই যুদ্ধ কবে আরম্ভ হয়েছিল। এবং কত দিন চলেছিল, সবই অনিশ্চিত। এ্যাপ্পিয়ান লিখেছেন যে উভয়ের মধ্যে সন্ধি এবং বিবাহ সম্পর্কিত চুক্তি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলেছিল। অনেকে মনে করেন সেলুকাস খ্রিস্টপূর্ব ৩০৫ অব্দে সিন্ধুতীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। জাসিনটন লিখেছেন যে, আন্তিগোনাসের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য স্বদেশে ফিরে যাওয়ার আগে সেলুকাস এই সন্ধি স্বাক্ষর করেন।

ভারতের অন্যত্র চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ এবং রাজ্যজয় সম্পর্কিত কোন তথ্য প্রাচীন গ্রীক লেখকের রচনায় পাওয়া যায় না। শুধু প্লুটার্কের একটি অস্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত তাঁর ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে সমগ্র ভারত বিধ্বস্ত ও পদানত করেছিলেন। শক ক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জুনাগড় স্তম্ভলেখ থেকে চন্দ্রগুপ্তের পশ্চিম ভারতে সৌরাষ্ট্র জয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই লেখতে চন্দ্রগুপ্তের "রাষ্ট্রীয়" (উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী) পুষ্যগুপ্তের উল্লেখ আছে, যিনি সেখানে বিখ্যাত সুদর্শন হ্রদ নির্মাণ করেছিলেন। ভৌগোলিক দিক থেকে অবন্তী জয় না করে সৌরাষ্ট্রে প্রবেশ সম্ভব ছিল না। সুতরাং মনে হয়, তিনি অবন্তীও জয় করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতে মগধ সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্পর্কে নিশ্চিত ও সরাসরিভাবে কিছু বলা যায় না। এই বিষয় জানতে হলে আমাদের পরবর্তীকালে তথ্যসমূহের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু এই বিস্তৃতির জন্য অশোকের কোন কৃতিত্ব ছিল না। এদিকে কলিঙ্গ বিজয়ই তাঁর একমাত্র কীর্তি, সুতরাং এই বিস্তারে লাভ অশোকের পূর্ববর্তী কোন রাজার সময় ঘটেছিল। যতদূর জানা যায়, বিন্দুসার কোন নতুন রাজ্য জয় করেন নি। তিনি কয়েকটি বিদ্রোহ দমন করেছিলেন মাত্র। সুতরাং এই বিস্তৃতি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় হয়েছিল। মহীশূর লেখতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। মধ্যযুগের কয়েকটি লেখতে বলা হয়েছে মহীশূরের অংশবিশেষ চন্দ্রগুপ্তের রক্ষণাধীনে ছিল। কিন্তু এই সাক্ষ্য পরবর্তীকালের হওয়ায় এর উপর নির্ভর করা যায় না। খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রথম দিকের কিছুসংখ্যক তামিল লেখক লিখেছেন যে, "ভম্বা মোরিয়"-গণ বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করেছিল। এই "ভম্বা" শব্দটির অর্থ "ভুঁইফোড়"। বিন্দুসার অথবা অশোক সম্পর্কে এই শব্দটি প্রযোজ্য ছিল না। একমাত্র চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কেই এটি ব্যবহৃত হতে পারত। সুতরাং কোন নিশ্চিত প্রমাণ না থাকলেও, বিপুল ও সুদৃঢ় ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে, দক্ষিণ ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রসারলাভের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের নাম অনায়াসে জড়িত করা যায়। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত থানা জেলায় সুর্পারক অথবা সোপারায় অশোকের একটি লেখ পাওয়া গেছে। তা থেকে মনে হয়, এই অঞ্চলটিও চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের জীবনের অন্যান্য দিক সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। অনেক পরবর্তীকালে জৈন ঐতিহ্য অনুসারে তিনি শেষ জীবনে সংসার ত্যাগ করেন, ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে জৈন অভিপ্রয়াণে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মহীশূরের অন্তর্গত শ্রাবণ-বেলগোলায় এসেছিলেন। সেখানে তৎকালীন প্রচলিত জৈন রীতি অনুসারে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করেন (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ)।

জৈন ঐতিহ্য অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু মেগাস্থিনিসের বর্ণনা এ বিষয়ে সন্দেহ উদ্রেক করে। তাঁর বর্ণনা থেকে চন্দ্রগুপ্তকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক বলে মনে হয়। মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে চন্দ্রগুপ্ত অন্তঃপুরে রণরঙ্গিণী দেহরক্ষিণীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের দিন তিনি বাইরে আসতেন। প্রাচীন গ্রীক লেখকগণ আরও লিখেছেন যে, অন্যান্য রাজাদের মতো চন্দ্রগুপ্তও পূজাবেদীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন।

৩খ.২.১ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা ঃ মেগাস্থিনিস

চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থার জন্য আমাদের প্রধানত মেগাস্থিনিসের রচনা এবং কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এর উপর নির্ভর করতে হয়। অশোকের লেখগুলিও আংশিকভাবে আমাদের সাহায্য করে। অশোকের লেখ থেকে তৎকালীন শাসনব্যবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায়, তা থেকে, অশোক এ বিষয়ে যে নতুনত্বের সৃষ্টি করেছিলেন, সেই অংশ বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, তাকে মোটামুটিভাবে চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা বলা যায়। শক ক্ষত্র্যা রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালেখ, পরবর্তীকালের হলেও, চন্দ্রগুপ্তের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার উপর আলোকপাত করে। এছাড়া *দিব্যবদান, মুদ্রারাক্ষস* এবং জৈন *পরিশিষ্ট পর্বণ,* যথাক্রমে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য এবং জৈন ঐতিহ্যের ধারক এই তিনটি গ্রন্থকেও চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে গৌণ উপাদান বলা যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে, মেগাস্থিনিসের মূল রচনা *ইন্ডিকা* পাওয়া যায় নি, কিন্তু পরবর্তীকালের অনেক লেখক তাঁদের গ্রন্থসমূহে মেগাস্থিনিস থেকে বহু উদ্ধৃতি সঙ্কলন ও সম্পাদনা করে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। মেগাস্থিনিস সম্পর্কিত আলোচনায় সোয়ানবেকের মতামত তাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, জার্মান ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন ভ্যাকক্রিডল।

এরিয়্যান, স্ট্রাবো এবং প্লিনির লেখা থেকে জানা যায় মেগাস্থিনিস সেলুকাসের প্রতিনিধি হয়ে প্রথমে এ্যারাকেসিয়ার শাসক সিবিরটায়সের কাছে এসেছিলেন। পরে তিনি সেখান থেকে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে আসেন। তিনি ঠিক কখন এসেছিলেন এবং এদেশে কতদিন ছিলেন, তা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে এটা ঠিক যে, চন্দ্রগুপ্ত এবং সেলুকাসের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তিনি এসেছিলেন। কারও কারও মতে খ্রিস্টপূর্ব ৩০২-২৮৮ অব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়, আবার অনেকের মতে, খ্রিস্টপূর্ব ৩০২ অব্দের আগে তিনি এদেশে এসেছিলেন। কেউ কেউ এমনও মনে করেন যে, মেগাস্থিনিস একাধিকবার ভারতে এসেছিলেন। সোয়ানবেক এই মত মেনে নিতে রাজি নন। তিনি মনে করেন যে, মেগাস্থিনিস দীর্ঘকাল পাটলিপুত্রে ছিলেন, তাই এদেশ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ তাঁর হয়েছিল।

সোয়ানবেক বলেছেন যে, দোষত্রুটি সত্ত্বেও মেগাস্থিনিসের রচনায় প্রাচীন ভারত সম্পর্কে গ্রীকদের জ্ঞান সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছিল। তাঁর রচনার গুরুত্ব শুধু তার নিজস্ব গুণের নয়, পরবর্তী লেখকেরা তার বহুল ব্যবহার করায়, এই রচনা গ্রীক ও ল্যাটিন জ্ঞানবিজ্ঞনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, এই জন্যও। বিভান বলেছেন

যে, কয়েক শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য জগৎ যে ভারতকে জানত, তা আলেকজান্ডারের সঙ্গীদের এবং মেগাস্থিনিসের বর্ণিত ভারত। অন্যান্য উপাদান থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় অনেক সময় মেগাস্থিনিসের রচনায় তার সমর্থন মেলে এবং এইভাবে জ্ঞানের সীমা প্রসারিত হয়। তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা এই যে তাঁর কালসীমা স্পষ্ট হওয়ায়, তিনি একটি নির্দিষ্ট যুগের ভারত চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, বলা যায়। *অর্থশাস্ত্র*-এর সঙ্গে তুলনায়, ইতিহাসের উপাদান হিসাবে, মেগাস্থিনিসের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে।

মেগাস্থিনিস গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটলিপুত্রকে ভারতের বৃহত্তম নগর বলে উল্লেখ করেছেন। এই নগরের দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে নয় মাইল এবং প্রস্থ পৌনে দুই মাইল। দুই শত ফুট চওড়া এবং ষাট ফুট গভীর জলপূর্ণ পরিখা দ্বারা এটি বেষ্টিত ছিল। এই পরিখার সঙ্গে সমান্তরাল একটি কাঠের বেষ্টনী এই নগরকে ঘিরে ছিল। এতে ৫৭০টি দুর্গ এবং ৬৪টি তোরণ ছিল। মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে, ভারতে ১১৮টি শহর ছিল। নদী অথবা সমুদ্রের নিকটবর্তী শহরগুলি ছিল কাঠের তৈরি, আর দূরবর্তী অথবা উচ্চস্থানে অবস্থিতি ছিল ইটের তৈরি।

মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে, পাটলিপুত্র নগরীতে চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ গ্রীকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। তাঁদের মতে সুসা অথবা একবাটানার পারস্য রাজপ্রাসাদ এর তুলনায় ম্লান ছিল। প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে পোষা ময়ূর, ছায়ানিবিড় কুঞ্জ এবং বৃক্ষের দ্বারা আকীর্ণ চারণক্ষেত্র ছিল।

চন্দ্রগুপ্ত এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে রণরঙ্গিনী নারী দেহরক্ষী পরিবৃত হয়ে বিলাসী জীবন যাপন করতেন। স্ট্রাবো লিখেছেন যে, তিনি শুধু যুদ্ধের সময় বিচারসভায় বিচারকের স্থান গ্রহণের জন্য, যজ্ঞে আহুতি দানের প্রয়োজনে এবং মৃগয়ার জন্য বাইরে আসতেন। কিন্তু হত্যার ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হত বলে তাঁর মনে শান্তি ছিল না। শাসনব্যবস্থায় তিনি সর্বোচ্চ অধিষ্ঠিত ছিলেন। সামরিক, বিচারবিষয়ক, শাসন ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সব দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হত। সারাদিন তাঁর কাজের বিরাম ছিল না। মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে, তাঁর দিবা-নিদ্রার সুযোগ ছিল না। তিনি সারাদিন রাজসভায় থাকতেন, বিচার ও রাষ্ট্রের অন্যান্য কাজের দেখাশুনা করতেন। দেহচর্চার সময় হলেও তাঁর এই কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হত না। তিনি যখন কেশচর্চা, অথবা পোশাক পরিধান করতেন, তখনও রাষ্ট্রের কাজ থেকে তাঁর অব্যাহতি ছিল না। এই সময়ে তিনি রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

শাসনকার্যে রাজাকে সাহায্য করার জন্য একটি ছোট উপদেষ্টা পরিষদ ছিল। মেগাস্থিনিস ভারতীয় জনসমষ্টিকে সাতটি জাতিতে ভাগ করেছিলেন। তার এই তালিকায় সপ্তম স্থান দেওয়া হয়েছে উপদেষ্টা এবং মূল্য অথবা রাজস্ব নিরূপকদের (কাউন্সিলরস্ ও এ্যাসেসরস্)। এরাই রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজাকে সাহায্য করতেন। সংখ্যায় কম হলেও, তাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশি। তাঁরা প্রাদেশিক শাসনকর্তা, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, নৌবাহিনীর অধিনায়ক, বিচারক এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নির্বাচন করতেন। মেগাস্থিনিসের তালিকায় ষষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে উপদর্শকদের (ওভারসিয়ারস) এই উপদর্শকদের প্রকৃত কার্য কী ছিল, স্পষ্ট জানা যায় না। বাসাম মনে করেন যে, মেগাস্থিনিস যাঁদের "উপদর্শক" বলেছেন, *অর্থশাস্ত্র*-এ তাঁদেরই "অধ্যক্ষ" বলা হয়েছে। কোশাম্বি বলেছেন যে, এই উপদর্শকগণ রাজাকে সব কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত রাখতেন। তাঁর মত সত্য হলে, এই উপদর্শকগণ গুপ্তচর বিভাগের অঙ্গ ছিলেন। মেগাস্থিনিস অবশ্য এঁদের ছাড়া অন্য গুপ্তচরের

(এপিস্‌কোপই) উল্লেখ করেছেন। তারা কখনও রাজার কাছে এবং গণতন্ত্রশাসিত অঞ্চলে ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে তাদের প্রতিবেদন পেশ করত। অশোকের লেখতে যে প্রতিবেদকের উল্লেখ আছে, তারা এই গুপ্তচরদের নামান্তর। এমনকি গুপ্তচরবৃত্তিতে গণিকাদেরও কাজে লাগানো হত, তার দ্বিধাহীন উল্লেখ তিনি করেছেন।

মেগাস্থিনিস জেলা শাসনের উপর আলোকপাত করেছেন। এই শাসনের ভারপ্রাপ্ত বেসামরিক কর্মচারীদের তিনি "এ্যাগ্রোনময়" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁদের যে কর্ম-তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে আছে ঃ (১) নদীর তত্ত্বাবধান, (২) জলকপাট পরিদর্শন, (৩) জমির পরিমাপ (অশোকের সময় রজজুকদের এটি অন্যতম কর্তব্য ছিল), (৪) শিকারীদের ভারগ্রহণ, প্রয়োজনমতো তাদের পুরস্কার প্রদান অথবা শাস্তি বিধান, (৫) কর সংগ্রহ, (৬) জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রধর কর্মকার, খনিশ্রমিক ইত্যাদির কাজের তত্ত্বাবধান এবং (৭) পথ ও স্তম্ভ নির্মাণ ও পথে দূরত্বজ্ঞাপক চিহ্ন স্থাপন। মেগাস্থিনিস এইভাবে যে ব্যাপক বেতনভুক্ত আমলাতন্ত্রের উল্লেখ করেছেন, *অর্থশাস্ত্র* -এর বর্ণনার সঙ্গে তার বিশেষ মিল দেখা যায়। এই আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করত। মেগাস্থিনিস এ্যাগ্রোনময়ের যে কর্ম-তালিকা দিয়েছেন, তার সঙ্গে *অর্থশাস্ত্র*-র সমহত্রীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রে পৌর শাসনব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের 'অস্টিনময়' বলে উল্লেখ করেছেন। এরা ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিলেন। প্রতিটি সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচ। প্রতিটি সমিতি পৃথকভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ভার পেত। সমিতিগুলি যথাক্রমে যে বিষয়গুলির ভার পেত, সেগুলি হল (১) শ্রম-শিল্প, (২) বৈদেশিকগণ (৩) জন্ম-মৃত্যুর হিসাব, (৪) খুচরা ব্যবসায়, ওজন ও মাপ, (৫) শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় এবং (৬) বিভিন্ন দ্রব্যের বিক্রীত মূল্যের এক-দশমাংশ কর হিসেবে আদায়। ছয় সমিতি সমষ্টিগতভাবে, সাধারণের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির (যেমন সাধারণের প্রয়োজনে নির্মিত অট্টালিকাসমূহের সংস্কার, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বাজার, শ্রমিক ও মন্দিরে তত্ত্বাবধান ইত্যাদি) দায়িত্ব গ্রহণ করত।

মেগাস্থিনিস পৌর শাসনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, অন্য কোথাও তার সমর্থন পাওয়া যায় না। তাই অনেকে এই বর্ণনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আবার অনেকে এই বিবরণকে যথার্থ মনে করে এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, পৌর শাসনের এই রেখাচিত্র আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বাসাম এই পৌর শাসন সম্পর্কে ততটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি। তিনি বলেছেন, পাটলিপুত্রে যেভাবে জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা হত এবং বিদেশীদের গতিবিধির উপর যেভাবে কড়া নজর রাখা হত, তাতে পাটলিপুত্রের তৎকালীন অবস্থার সঙ্গে আধুনিক পুলিশ রাষ্ট্রের অবস্থার তুলনা করা যায়।

মেগাস্থিনিস, এ্যাগ্রোনময় এবং অস্টিনময় ভিন্ন তৃতীয় একশ্রেণীর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর উল্লেখ করেছেন। এঁরা সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। কৌটিল্য বর্ণিত বলাধ্যক্ষের সঙ্গে এঁদের মিল পাওয়া যায়। অস্টিনমির মতো এঁরাও ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিলেন। প্রতি সমিতিতে পাঁচজন সদস্য থাকত। ছয়টি সমিতি যথাক্রমে নৌবহর, সৈন্যদলের রসদ সরবরাহ ও যানবাহন, পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ এবং হস্তী, এই ছয়টি বিভাগের দায়িত্ব পেত। তার এই বর্ণনা কতটা সত্য ছিল, এ সম্পর্কে বাসাম সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মেগাস্থিনিস এখানে পৌর সংগঠন কাঠামোরই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

মেগাস্থিনিস স্থায়ী সৈন্যদলের উল্লেখ করেছেন। প্লুকার্ট লিখেছেন, সৈন্যসংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ। মেগাস্থিনিস

লিখেছেন, সংখ্যার দিক থেকে, কৃষকদের পরেই সৈন্যদের স্থান ছিল। এ্যারিয়ান লিখেছেন, ভারতীয় ধনুক ছিল ছয় ফুট লম্বা। মেগাস্থিনিস লিখেছেন, ভারতীয় তীরন্দাজ বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করবার সাধ্য কারও ছিল না। তাদের লম্বা তীর যুগপৎ ঢাল এবং বক্ষবর্ম ভেদ করে যেত। মেগাস্থিনিস আরও লিখেছেন যে, আশেপাশে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চললেও কৃষকেরা নির্বিঘ্নে জমি চাষ করতে পারত। বাসাম এই উক্তিকে অতিরঞ্জিত মনে করেন।

মেগাস্থিনিস সৈন্যদল প্রসঙ্গে ঘোড়া ও হাতির জন্য রাজকীয় আস্তাবল এবং রাজকীয় অস্ত্রাগারের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ঘোড়া, হাতি বা অস্ত্র, কোনকিছুই সৈনিকের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল না। ওগুলি ছিল রাজার সম্পত্তি। যুদ্ধ শেষ হলে, ঘোড়া বা হাতি আস্তাবলে এবং অস্ত্রাদি রাজকীয় অস্ত্রাগারে ফিরিয়ে দেওয়া হত।

৩খ.২.২ চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা ঃ অর্থশাস্ত্র

অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটির সঙ্গে দীর্ঘকাল ভারতবাসীর কোন পরিচয় ছিল না। ১৯০৫ সালে, মহীশূরের পণ্ডিত, ডঃ শাম শাস্ত্রী সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটি আবিষ্কার করেন। ১৯০৯ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য অথবা বিষ্ণুগুপ্ত এই গ্রন্থের রচয়িতা। লেখক এই গ্রন্থে মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা আলোচনা করেন নি। তিনি রাষ্ট্রের তত্ত্ব ও নীতি আলোচনা করেছেন। সমগ্র গ্রন্থটি অক্ষত অবস্থায় প্রকাশিত হয়নি। মূল গ্রন্থের শতকরা কুড়ি থেকে পঁচিশ ভাগ অংশ হারিয়ে গেছে। কোন একটি অধ্যায়ে পুরোপুরিভাবে নয়, সব অধ্যায়েরই কিছু কিছু অংশ, পুনরায় নকল ককরার সময় বাদ পড়ে গেছে।

অর্থশাস্ত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পরবর্তীকালে হলেও, এটি চন্দ্রগুপ্ত বিষয়ক গ্রন্থ। তাই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা আলোচনা করার আগে *অর্থশাস্ত্র*-এ যে রাষ্ট্রের কল্পনা করা হয়েছে, তার স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য কী ছিল, জানা প্রয়োজন। মার্কসীয় দৃষ্টিতে সব রাষ্ট্রেই একটি শ্রেণীগত ভিত্তি থাকে। যেমন বলা যায় যে, যজ্ঞপ্রধান ব্রাহ্মণদের উপজাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল ক্ষত্রিয় শ্রেণী, মধ্যযুগের ভারতে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ভিত্তি ছিল জমিদার শ্রেণী। *অর্থশাস্ত্র*-এ যে রাষ্ট্রের কল্পনা করা হয়েছে, তার ভিত্তি দুর্বল, কেননা তার পিছনে কোন স্বাভাবিক এবং ব্যাপক শ্রেণী সমর্থন ছিল না।

অর্থশাস্ত্র-এর নীতিসমূহ যখন রচিত হয়েছিল, ভারতে আর্য উপজাতিদের ধ্বংসসাধন তখনও শেষ হয়নি, যদিও জমির ব্যক্তিগত মালিকানা লাভের ফলে তারা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ভারতে বিস্তৃত এবং গভীর অরণ্য অঞ্চল পরিষ্কার করার কাজ তখনও বাকি ছিল। কৌটিল্যের রাষ্ট্রকে তাই এই কাজে প্রধানত আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। এই রাষ্ট্রই ছিল বৃহত্তম জমিদার, ভারি শিল্পের শ্রেষ্ঠ মালিক, প্রধান পণ্য-উৎপাদক। রাষ্ট্রের এই বিবিধ ভূমিকার প্রয়োজনে সৃষ্ট হয়েছিল একটি বৃহৎ শাসকগোষ্ঠী। বিভিন্ন স্তরের আমলাতন্ত্র পাঁচ লক্ষ সৈন্যের একটি স্থায়ী বাহিনী এবং বিরাট গুপ্তচর শ্রেণী, এরাই এই নতুন রাষ্ট্রের প্রধান সমর্থক ছিল। যে গৃহপতি-কৃষক-বণিক শ্রেণী এই গাঙ্গেয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্ভব করেছিল, তার শাসন পরিচালনায় তাদের কোন স্থান ছিল না। যে ব্যাপক গুপ্তচর ব্যবস্থা যুবরাজ থেকে শুরু করে হীনতম গ্রামবাসীর উপর কড়া নজর রাখত, সেই ব্যবস্থাই পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে যে, আমলাতন্ত্রের বাইরে এই রাষ্ট্রের কোন শ্রেণীসমর্থন ছিল না।

অর্থশাস্ত্র-র রাষ্ট্র সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী এবং সর্বোচ্চ একচেটিয়া অধিকার ভোগী। এই অধিকার প্রয়োগের পক্ষে যে উপজাতীয় প্রথাগুলি অন্তরায়, এতে সেগুলি ধ্বংস করার সুস্পষ্ট বিধান ছিল। কিন্তু তবুও এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আপাতদৃষ্টিতে যতটা বলবান মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে এ তা ছিল না। কেননা, এর অভ্যন্তরে দুর্বলতা বীজ নিহিত ছিল। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের কোন স্থান ছিল না। রাষ্ট্র সব কিছু নিয়ন্ত্রণ এবং সব কিছু থেকে লাভ করত। একজন বেসরকারী ব্যবসায়ীকে "কণ্টক" জ্ঞান করা হত। ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে *অর্থশাস্ত্র*-র রাষ্ট্র ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করেছিল। *অর্থশাস্ত্র*-র অর্থনীতি ক্রমবর্ধমান যা বাণিজ্য এবং উৎপাদনের বলেই কেবল কার্যকর হতে পারত। তাই পরে লাভজনক এলাকায় বাণিজ্য সম্প্রসারণের যখন অবসান ঘটল, তখন এই অর্থনীতির ব্যর্থতাও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। সব চেয়ে বড় কথা, এই রাষ্ট্রনীতির মধ্যে একটি মৌলিক স্ববিরোধিত ছিল। এই নীতি অনুসারে সমাজের একদিকে ছিল সাধারণ মানুষ, যাদের জন্য আইন-শৃঙ্খলার বিষয়গুলি চরম সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হত, যারা নৈতিক এবং আইনানুগ জীবন যাপন করত, আর অন্যদিকে ছিলেন অনৈতিক রাজা, যাঁর পক্ষে, প্রজা এবং প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে যেকোন রকম অপরাধ করায় নীতিগত কোন বাধা ছিল না অশোক তাঁর সংস্কারের দ্বারা এই স্ববিরোধিতা দূর করেছিলেন।

হিন্দু রাষ্ট্রব্যবস্থা কয়েকটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। চন্দ্রগুপ্তর শাসনব্যবস্থায় সেই নীতি সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছিল মনে হয় না। এই নীতি অনুসারে রাজা জনগণের কল্যাণের জন্য দায়ী থাকতেন এবং তাঁকে বর্ণাশ্রম সমর্থন করতে হত। হিন্দুরা রাষ্ট্রকে একটি অবয়ব হিসেবে দেখত। এই অবয়বের যে সাতটি অঙ্গ ছিল তা হল (১) স্বামী (সর্বোচ্চ শাসক), (২) অমাত্য (মন্ত্রী), (৩) পুর (শহরাঞ্চল), (৪) রাষ্ট্র (গ্রামাঞ্চল), (৫) কোষ (কোষাগার), (৬) দণ্ড (শাস্তি বিধায়ক) এবং (৭) মিত্র। এদের সকলকে নিয়ে একটি মণ্ডল বা চক্র গঠিত হত। রাজাকে তাই 'চক্রবর্তী' বলা হত। তিনি এই চক্রের কেন্দ্রে অধিষ্ঠান করতেন।

প্রাচীন ভারতে মনে করা হত যে মাৎস্যন্যায় দূর করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রধান অঙ্গ ছিল চারটি : রাজা, সচিব অথবা অমাত্য, মন্ত্রিপরিষদ এবং অধ্যক্ষ। রাজার উপাধি ছিল রাজন্। এই রাজন শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে দুই প্রকার মত প্রচলিত আছে। কেননা সংস্কৃতে রঞ্জন শব্দের, যা থেকে রাজন শব্দের উৎপত্তি, দুইটি অর্থ। একটি আলো দান করা অন্যটি আনন্দ দান করা। সুতরাং রাজন, আলো অথবা আনন্দের উৎসরূপে বিবেচিত হতেন বলা যায়।

তাঁর অপর একটি উপাধি ছিল, "দেবানাং পিয়"। সমসাময়িক সিরিয়ার রাজা এ্যান্টিওকাসের উপাধি ছিল "থিয়স" অর্থাৎ দেবতা। কিন্তু পাটলিপুত্রে দেবতা নয়, "দেবতাদের প্রিয়", শাসন করতেন। রাজার সঙ্গে সাধারণ মানুষের তৎকালীন সম্পর্ক নির্ধারণ তিনটি দলিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অশোকের ষষ্ঠ শিলালেখতে এবং জুনাগড় শিলালেখতে 'আঋণ্য' অর্থাৎ ঋণ থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। জনসাধারণের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করে, তিনি এই ঋণ শোধ করতে পারতেন। রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক ছিল, এক্ষেত্রে উত্তমর্ণের সঙ্গে অধমর্ণের, অর্থাৎ দেনাপাওনার। সাধারণ মানুষ রাজাকে তাদের উৎপন্ন ফসলের 'ষড়ভাগ', অর্থাৎ এক-ষষ্ঠাংশ কর দিত। বিনিময়ে, তিনি তাদের রক্ষা করতেন। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে, তাঁকে সিংহাসনচ্যুত, এমনকি হত্যা করা যেত। প্রজার সঙ্গে রাজার পিতৃত্বের সম্পর্কও ছিল। অশোকের লেখতে সে কথা জানা যায়।

রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান, তাঁর সার্বভৌমত্বের প্রকাশ ও প্রতীক। তাঁর ক্ষমতার উপর সাংবিধানিক বিধিনিষেধ তেমন কিছু ছিল না। তবে রাজকীয় কর্তৃত্ব সৃষ্টির পূর্ব থেকে কিছু বিধান প্রচলিত ছিল, যেগুলিকে 'পোরান পকিতি' বলা হত। পরম শক্তিশালী রাজাও এগুলিকে মর্যাদা দিতেন। জনগণের প্রতি তাঁর নৈতিক দায়িত্ববোধ তাঁকে স্বেচ্ছাচারী হতে দিত না। স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় আংশিক বিকেন্দ্রীকরণ রাজশক্তিকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করত। এসব সত্ত্বেও চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থাকে "উদার স্বেচ্ছাতন্ত্র" ভিন্ন অন্য কোন আখ্যা দেওয়া যায় না।

অর্থশাস্ত্র-এ যে রাজার কথা বলা হয়েছে, তাঁকে অসাধারণ গুণের হতে হত। সেখানে আছে যে, তিনি হবেন তেজোময় এবং সদা-জাগ্রত। তিনি প্রতিদিনের কিছু অংশ অধ্যয়নে এবং চিন্তায় ব্যয় করবেন। রাজ্যের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে কর্মব্যস্ত মানুষ। দিবারাত্রির প্রতিটি প্রহরে তিনি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতেন। কার্যনির্বাহী বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল রাজার। রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করতেন, সাধারণ মানুষ এবং সরকারী কর্মচারীদের জন্য অনুশাসনগুলি প্রচার করতেন। চন্দ্রগুপ্ত সঞ্চারদের মতো গূঢ় পুরুষের সাহায্যে এবং অশোক ভ্রাম্যমাণ বিচারকদের মাধ্যমে দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতেন। বিস্তৃত পথ এবং স্থানে স্থানে নির্মিত দুর্গ তাঁদের একাজে সাহায্য করত। *অর্থশাস্ত্র*-এ প্রহরী মোতায়েন করা, আয়ব্যয়ের হিসাব দেখা, শহর ও গ্রামের মানুষের বিভিন্ন ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য রাখা,অধ্যক্ষনিয়োগ করা, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার ও গুপ্তচরদের নিকট থেকে গোপন সংবাদ গ্রহণ করা ইত্যাদি, তাঁর কার্যনির্বাহী ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রাজা যে শুধুমাত্র কার্যনির্বাহী বিভাগের প্রধান ছিলেন, তাই নয়। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, সর্বোচ্চ বিচারক এবং ধর্মপ্রবর্তক (আইন প্রণেতা)। সর্বাধিনায়করূপে তিনি হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকবাহিনীর তত্ত্বাবধান এবং প্রধান সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ-পরিকল্পনা আলোচনা করতেন। কখনও বা রাজা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতেন। সম্রাট অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাজা ছিলেন বিচার বিভাগের শীর্ষে। শুধু নীতিগতভাবে নয়, কার্যত তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। মেগাস্থিনিসের বিবরণে (পূর্বে আলোচিত) এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। *অর্থশাস্ত্র*-এ রাজার বিচার বিষয়ক দায়িত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, রাজদরবারে বিচারপ্রার্থী হয়ে কাউকে যেন দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে না হয়।

রাজা আইন পরিবর্তন করতে না পারলেও তা সংশোধন করতে পারতেন। অশোকের সময় ফৌজদারী আইন বিশেষভাবে সংশোধিত হয়েছিল। তাছাড়া প্রথাগত আইন সম্পর্কে রাজার অধিকার ছিল অনেক ব্যাপার। তিনি প্রথাগত আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, অথবা নাকচ করতে পারতেন। এই বিধানগুলিকে আইনের মর্যাদা দেওয়া হত এবং রাজকীয় কর্মচারীরা সেগুলি কঠোরভাবে কার্যকর করতেন। *অর্থশাস্ত্র*-এ "রাজশাসন" অর্থাৎ রাজকীয় অনুশাসনকে অন্যতম উৎস বলা হয়েছে এবং রাজাকে 'ধর্মপ্রবর্তক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অশোকের অনুশাসনগুলি রাজার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার নিদর্শন হয়ে গেছে।

কৌটিল্য বলেছেন যে, একমাত্র অন্যের সাহায্যে সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করা সম্ভব। সুতরাং তিনি সচিবদের নিযুক্ত করবেন এবং তাদের মতামত শুনবেন। কৌটিল্যের এই "সচিব" অথবা "আমাত্য"-দের সঙ্গে মেগাস্থিনিস তাঁর বর্ণনায় যাদের সপ্তম স্থান দিয়েছেন, সেই "উপদেষ্টা এবং রাজস্বনিরূপক"দের বিশেষ মিল দেখা যায়। সংখ্যায় কম হলেও এই শ্রেণীর প্রভাব কম ছিল না।

এই সচিব অথবা অমাত্যদের মধ্যে যাঁরা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাঁদের বলা হত মন্ত্রিণ। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, এই মন্ত্রিণগণের সঙ্গে অশোকের সময়ের 'মহামাত্র'দের বিশেষ মিল আছে। অমাত্যগণের মধ্যে যাঁরা প্রলোভনের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাদের মধ্যে থেকে মন্ত্রিণগণ হতেন। তাঁরা সর্বোচ্চ বেতন, বাৎসরিক ৪৮,০০০ পাণ (রৌপ্য মুদ্রা) পেতেন। শাসনসম্পর্কিত যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে, রাজা তিন-চারজন মন্ত্রিণের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। জরুরি অবস্থার উদ্ভব হলে, মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে মন্ত্রিণগণও আহূত হতেন। যুবরাজদের উপর তাঁদের আংশিক নিয়ন্ত্রণ ছিল। তাঁরা রাজার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন এবং সৈন্যদের উৎসাহ দিতেন। কৌটিল্য অবশ্যই অন্যতম মন্ত্রিণ ছিলেন। মন্ত্রিণদের সংখ্যা যে একাধিক ছিল, *অর্থশাস্ত্র*-এ "মন্ত্রিণঃ" শব্দের ব্যবহার থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মন্ত্রিণগণ ছাড়া একটি "মন্ত্রিপরিষদ" ছিল। অশোকের লেখতে যে "পরিষদ"-এর উল্লেখ আছে, তা মন্ত্রিপরিষদ। এই মন্ত্রিপরিষদের মৌর্যদের সংবিধানে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। মন্ত্রিপরিষদের সব সদস্যই 'মন্ত্রিণ' ছিলেন, এমন নয়। *অর্থশাস্ত্র*-এ "মন্ত্রিপরিষদম্ দ্বাদশামাত্যান কুর্বিতা" এই কথাগুলি আছে। এ থেকে মনে হয় যে, শুধু মন্ত্রিণগণদের তুলনায়, মন্ত্রিপরিষদের স্থান ছিল নিচে। এই পরিষদের সদস্যদের বার্ষিক বেতন ছিল মাত্র ১২,০০০ পণ। তাছাড়া স্বাভাবিক সময়ে তাঁদের ডাকা হত না। শুধুমাত্র জরুরী অবস্থায় তাঁরা মন্ত্রিণগণের সঙ্গে আহূত হতেন। এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা ঠিক কত ছিল, বলা যায় না : কৌটিল্য "ক্ষুদ্র পরিষদ"কে নিন্দা এবং "অক্ষুদ্র পরিষদ" বিষয়ে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মনে হয় কৌটিল্য পরিষদের সদস্য সংখ্যা যথাসম্ভব বৃদ্ধি করে, বর্ধিষ্ণু সাম্রাজ্যের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষপাতী ছিলেন।

সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই মন্ত্রিণগণের এবং মন্ত্রিপরিষদের সামনে উপস্থিত করা হত। পরিষদের সভায় অনুপস্থিত সদস্যদের মতামতও জেনে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই পরিষদের অস্তিত্ব থেকে মনে হয় যে, নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্র সম্ভব ছিল না। তাছাড়া রাজা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ করতেন, এমন ইঙ্গিতও *অর্থশাস্ত্রে* পাওয়া যায়।

পূর্বে বর্ণিত দুই শ্রেণীর অমাত্য ছাড়াও তৃতীয় একশ্রেণীর অমাত্য ছিলেন, যাঁরা শাসন ও বিচারবিভাগের পদগুলিতে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে তাঁদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় এবং যথোচিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হত। *অর্থশাস্ত্র*-এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। যে অমাত্যগণ ধর্মীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন তাঁদের দেওয়ানি এবং ফৌজদারী বিচারালয়ে নিয়োগ করা হত। যাঁরা অর্থ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাঁদের সামাহর্ত্রী (রাজস্ব আদায়ের সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত) এবং সন্নিধাত্রী (কোষাগারের ভারপ্রাপ্ত) পদে নিযুক্ত করা হত। অনুরূপভাবে যাঁরা প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাঁদের প্রমোদ-উদ্যানে এবং যাঁরা সাহসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাঁদের তাৎক্ষণিক কাজে নিযুক্ত করা হত। যাঁরা অনুত্তীর্ণ হতেন, তাঁদের খনি, কারখানা, হস্তী-অধ্যুষিত অরণ্য ইত্যাদিতে নিযুক্ত করা হত। অপরীক্ষিত অমাত্যগণ সাধারণ বিভাগে কাজ করতেন। অমাত্যপদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী থাকলে কোন ব্যক্তি লেখক (চিঠিপত্র বিভাগে মন্ত্রী) রাজদূত অথবা অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হতে পারতেন।

মৌর্যযুগের অমাত্যগণ সর্বপ্রথম সরকারী কর্মচারী হিসাবে একটি পৃথক জাতি বলে গণ্য হতেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে 'অমাত্যকুল' শব্দটির উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনিসও তাঁদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে পুরোহিতের স্থান ছিল সর্বাগ্রে। তিনি রাজার ধর্মীয় উপদেষ্টা

ছিলেন। কিন্তু প্রজাদের ধর্মীয় জীবনের উপর তাঁর কোন অধিকার ছিল না। তিনি কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে চরম শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হত না। পুরোহিতের পরে স্থান ছিল যুবরাজের। তিনি কার্যনির্বাহী বিভাগের অন্তর্গত কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, না সাধারণভাবে শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করতেন, তা সঠিক বলা যায় না। সেনাপতি সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কেও কিছুটা অনিশ্চয়তা আছে। তিনি সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, না যুদ্ধ-মন্ত্রী ছিলেন, বলা কঠিন। রাজদ্বারের, সুতরাং রাজার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন প্রতিহার। অন্তরবংশিক রাজ-অন্তঃপুরের তত্ত্বাবধান করতেন।

এঁরা ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষগণ ছিলেন। খনি বিভাগের অকরাধ্যক্ষ, সামরিক এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন বিভগের গো-অধ্যক্ষ, হস্তী-অধ্যক্ষ, নাবধ্যক্ষ, রথাধ্যক্ষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জলদস্যু দমন, বন্যাপীড়িত মানুষের উদ্ধার, সামুদ্রিক শুল্ক আদায় ইত্যাদি নৌ-অধ্যক্ষের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যান্য অধ্যক্ষদের মধ্যে সুতাধ্যক্ষ (কৃষি বিভাগ), সূত্রাধ্যক্ষ (বয়ন শিল্প) শুল্কাধ্যক্ষ (শুল্ক বিভাগ), মদিরাধ্যক্ষ, গণিকাধ্যক্ষ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সরকারি কর্মচারীদের এই বিস্তৃত তালিকা থেকে সে যুগে জনজীবনের বিভিন্ন দিকের উপর ব্যাপক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সে যুগে প্রতিটি সরকারি কর্মচারীকে তাঁর বেতন নগদ অর্থে দেওয়া হত। সর্বোচ্চ বেতন, বার্ষিক ৪৮,০০০ পাণ পেতেন মন্ত্রিণ, প্রধান পুরোহিত, প্রধানা মহিষী, রাজমাতা, যুবরাজ এবং সেনাপতি। রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত নিম্নতম শ্রমিকের বেতন ছিল বার্ষিক ৬০ পাণ। সূত্রধন এবং কারিগরেরা পেত বার্ষিক ১২০ পাণ। ভারী অস্ত্রবাহী কোন সৈন্য, সামরিক শিক্ষালাভের পর পেত ৫০০ পাণ। হিসাবরক্ষকের বেতনও অনুরূপ ছিল। খনি বিশেষজ্ঞ এবং স্থপতি বৎসরে ১,০০০ পাণ পেতেন। উত্তম গুপ্তচর যে নানা ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারত, সেও একই পরিমাণ অর্থ পেত। নিম্নস্তরের গুপ্তচরদের বেতন ছিল এর অর্ধেক। কার্যরত অবস্থায় পঙ্গু হলে অথবা মৃত্যু হলে নিয়মিত বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ছিল।

তৎকালীন এই ব্যাপক বেতন ও ভাতা দান সম্পর্কে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কখনও এমন কিছু দেওয়া হত না, যাতে স্থায়ীভাবে রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পায়। কোন কারণে নগদ অর্থের ঘাটতি দেখা দিলে রাজা তাঁর ভাণ্ডার থেকে যেকোন দ্রব্য দান হিসাবে দিতে পারতেন, কিন্তু জমি অথবা সমগ্র গ্রাম দান করার অধিকার তাঁর ছিল না।

চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য পারস্য সীমান্ত থেকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বৃহৎ সাম্রাজ্য, তৎকালীন অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য, রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে শাসন করা সম্ভব ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তাই আকেমেনীয় সাম্রাজ্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, তাঁর সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি প্রদেশে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অনুকরণে একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তোলেন। প্রাদেশিক শাসনকে তাই কেন্দ্রীয় শাসনের অবিকল প্রতিরূপ বলা যায়। দেবানাং পিয় কেন্দ্রে শাসন করতেন, আর যিনি রাজার প্রিয়, তিনি প্রদেশে শাসন করতেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় এই প্রদেশগুলির সংখ্যা কত ছিল তা জানা যায় না। তবে অশোকের সময় মৌর্য সাম্রাজ্য উত্তরাপথ, অবন্তীপথ, দক্ষিণাপথ, কলিঙ্গ ও প্রাচ্য এই পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এদের রাজধানী

যথাক্রমে তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, সুবর্ণগিরি, তোসালী এবং পাটলিপুত্র। এই প্রদেশগুলির মধ্যে কলিঙ্গ অবশ্যই চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দক্ষিণাপথ সম্পর্কে সামান্য অনিশ্চয়তা থাকলেও ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন, এটি সম্ভবত অন্যতম প্রদেশ ছিল। সীমান্তবর্তী প্রদেশের শাসনভার সাধারণত কোন যুবরাজকে দেওয়া হত। উদাহরণস্বরূপ তক্ষশিলার কথা বলা যায়। সেলুকিড বংশ শাসিত যোন রাজ্যের বিরুদ্ধে এখানে সতর্ক দৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। দক্ষিণে সুবর্ণগিরির শাসনভার "আর্যপুত্রের" উপর ছিল। সাধারণত "আর্যপুত্র" এবং যুবরাজ সমার্থক মনে করা হয়। ডঃ রায়চৌধুরী তা মনে করেন না, ভাসের একটি নাটকে "আর্যপুত্র" শব্দটি "কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্তান" এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ডঃ রায়চৌধুরী এই দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণের পক্ষপাতী। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রাচ্য প্রদেশটি সম্রাটের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল।

এই প্রদেশগুলি ছাড়া মৌর্য ভারতে এমন কয়েকটি অঞ্চল ছিল, যেগুলি কতকাংশে স্বাধীনতা ভোগ করত। এ্যারিয়ান স্বয়ংশাসিত জনগোষ্ঠীর এবং গণতন্ত্রশাসিত নগরসমূহের উল্লেখ করেছেন। কৌটিল্য 'সঙ্ঘে'র কথা বলেছেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ কম্বোজ এবং সুরাষ্ট্রের উল্লেখ করেছেন। অশোকের ত্রয়োদশ শিলালেখতে কম্বোজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা জানা যায়। অশোকের পঞ্চম শিলালেখতে (কলসিতে প্রাপ্ত) তাঁর সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থানকারী যোনগণ, কম্বোজগণ এবং গন্ধারগণের স্পষ্ট উল্লেখের পর, সীমান্তে বসবাসকারী "অন্যান্য"দের সম্পর্কে অস্পষ্ট উচ্চারণ আছে।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় এই সুরাষ্ট্র তাঁর "রাষ্ট্রীয়" পুষ্যগুপ্তের শাসনাধীন ছিল এবং পুষ্যগুপ্ত বিখ্যাত সুদর্শন হ্রদের তীরে একটি বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। অশোকের লেখতে অথবা *অর্থশাস্ত্র*-এ "রাষ্ট্রীয়" নামধেয় কোন পদের উল্লেখ নেই। তাই "রাষ্ট্রীয়" বলতে ঠিক কী বোঝায় তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, "রাষ্ট্রীয়" এবং "রাষ্ট্রপাল" হয়তো সমার্থক ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের সময় প্রাদেশিক শাসনের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। প্রথমত, প্রাদেশিক শাসনসংক্রান্ত পদগুলি বংশানুক্রমিক ছিল না। দ্বিতীয়ত, প্রতি প্রদেশে শাসনকর্তাদের সঙ্গে কয়েকজন মহামাত্র থাকতেন। রাজা কখনও কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে এককভাবে কিছু বলতেন না। তিনি সর্বদা তাঁদের এবং মহামাত্রদের যুক্তভাবে আহ্বান জানাতেন। এ থেকে প্রাদেশিক শাসনে মহামাত্রদের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ও মহামাত্রদের একটি পরিষদ ছিল। তৃতীয়ত, রাজা গূঢ়পুরুষদের মাধ্যমে সমস্ত তথ্য অবগত হতেন।

এই গূঢ়পুরুষগণ রাষ্ট্রে ব্যাপক গুপ্তচর ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ ছিল। মেগাস্থিনিস বর্ণিত 'এপিসকপয়' এবং অশোকের লেখ-এ প্রাপ্ত 'প্রতিবেদক' অভিন্ন। স্ট্রাবো এই শ্রেণীর মানুষদের "পরিদর্শক" (এপোরি) আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা আস্থাভাজন ব্যক্তিরাই এই পদে নিযুক্ত হত। *অর্থশাস্ত্র*-এ এদেরই হয়তো "গূঢ়পুরুষ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। স্ট্রাবো এবং কৌটিল্য উভয়েই গুপ্তচর বৃত্তিতে বহুসংখ্যক মহিলা নিয়োগের উল্লেখ করেছেন। *অর্থশাস্ত্র*-এ গুপ্তচরদের সংস্থাঃ এবং সঞ্চারাঃ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যারা নির্দিষ্ট স্থানে থাকত তাদের বলা হয়েছে সংস্থাঃ তাদের মধ্যে গৃহী, ব্যবসায়ী এমনকি সন্ন্যাসীরাও ছিল। আর যারা স্থান থেকে স্থানান্তরে সঞ্চরণ করত তাদের বলা হয়েছে সঞ্চারাঃ। এদের মধ্যে অন্যান্যদের সঙ্গে, ভিক্ষুকী, পরিব্রাজিকা এবং গণিকারাও থাকত।

মৌর্য যুগে প্রদেশকে সম্ভবত 'দেশ' বলা হত। 'দেশ' আবার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে এই অংশগুলির নামও বিভিন্ন হত। সাম্রাজ্যের মধ্যভাগে এগুলিকে বলা হত বিষয় বা অহর। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এর নাম ছিল সম্ভবত প্রদেশ। প্রাদেশিকগণ প্রদেশ শাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। কখনও বা এগুলিকে "জনপদ" বলা হত। জনপদ বলতে প্রধানত গ্রামাঞ্চল বোঝাত। এই জনপদগুলিই ছিল মৌর্য শাসনব্যবস্থার প্রকৃত ভিত্তি। প্রতি জনপদে কয়েকজন মহামাত্র থাকতেন। জনপদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপর একশ্রেণীর কর্মচারীকে বলা হত রজুক।

শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন এবং ক্ষুদ্রতম একক ছিল গ্রাম। তখন গ্রাম-শাসনের ক্ষেত্রেও ক্ষমতার স্তরভেদ ছিল। নিম্নতম স্তরে ছিলেন গ্রামিক। তাঁর প্রকৃত অবস্থা কী ছিল বলা কঠিন। *অর্থশাস্ত্র*-এ রাষ্ট্রের বেতনভুক কর্মচারীদের যে তালিকা আছে, তাতে গ্রামিকের উল্লেখ নেই। তাই ডাঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, গ্রামিক ছিলেন গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত কর্মচারী।

গ্রামিক শাসন বিষয়ে সামান্য ক্ষমতা ভোগ করতেন। গ্রামে চুরি-ডাকাতির জন্য তিনি দায়ী ছিলেন। এর ফলে কোন ক্ষতি হলে, তিনি তা পূরণ করতেন। চোর, ভেজালকারবারী, অন্য দুষ্কৃতিকারীদের গ্রাম থেকে বিতাড়িত করার অধিকার তাঁর ছিল। বিনিময়ে তিনি গ্রামীণ রাজত্বের একাংশ ভোগ করতেন। গ্রামবৃদ্ধগণ গ্রামিককে সাহায্য করতেন।

গ্রামিকের উপরে ছিলেন গোপ। তিনি পাঁচ অথবা দশটি গ্রামের উপরে ছিলেন সমাহর্ত্রী। তাঁর এবং স্থানিকের মধ্যে প্রদেষ্ট্রি ভিন্ন অন্য কোন কর্মচারী ছিল না। এই প্রদেষ্ট্রিগণ ছিলেন সমাহর্ত্রীর ভ্রাম্যমাণ সহকারী। তাঁদের জন্য কোন নির্দিষ্ট এলাকা ছিল না। এইসব স্থানীয় কর্মচারীদের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, সাধারণ তথ্য সংগ্রহ, গুপ্তচরদের নির্দেশ দান, জনসংখ্যা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিষয়ক বিশেষ তথ্য সংগ্রহ, মদের ব্যবসা ও যাতায়াতের জন্য অনুমতিপত্র প্রদান ইত্যাদি কাজ করতে হত। তাছাড়া সাধারণের ব্যবহার্য পথঘাট, বিশ্রামাগার, জলসেচ প্রণালী এবং মন্দিরগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তাঁদের উপর ছিল।

গ্রামকে তৎকালীন অর্থনীতির একক হিসাবে গণ্য করা হত। প্রতিটি গ্রাম 'ভাগ' এবং 'বলি' এই দুইটি করের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রতিটি গ্রামকে ঘিরে সাধারণের ব্যবহার্য গোচারণ ক্ষেত্র থাকত। অবৈধভাবে এই ক্ষেত্রসীমা লঙ্ঘন করলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। গ্রামবাসীরা নতুন দীঘি খনন, অথবা নষ্ট দীঘি পুনরুদ্ধার করলে তাদের কর মকুব করা হত। কোন কোন গ্রামে উদ্বৃত্ত জমি 'গ্রামভৃতক'গণের সাহায্যে চাষ করা হত। এই 'গ্রামভৃতক' অর্থাৎ গ্রামভৃত্য বলতে ঠিক কী বোঝাত, বলা কঠিন। ডাঃ রায়চৌধুরী এদের সম্মানের আসন দিয়েছেন। তাঁর মতে এঁরা ছিলেন গ্রামে নিযুক্ত সরকারের বেতনভুক কর্মচারী। অনেকে আবার এঁদের গ্রামের গরিব অথবা ক্রীতদাস, এই অর্থে নিয়েছেন।

অনেকাংশে স্বয়ংশাসিত গ্রামের প্রশাসন যোগ্য হয়ে উঠেছিল, সন্দেহ নেই। কেননা, একথা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, কৃষকদের সর্বপ্রকার ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা হত।

বিচারব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন রাজা স্বয়ং। রাজকীয় বিচারালয়ের স্থান সর্বোচ্চ ছিল। রাজা স্বয়ং বিচার করতেন। সুতরাং বিচারব্যবস্থায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব শুধু নীতিগতভাবে ছিল না, কার্যত ছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজকীয় বিচারালয় ভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্য আরও দুই রকমের বিচারালয় ছিল। শহরে মহামাত্রগণ বিচার করতেন। অশোকের লেখতে এঁদের "নগর ব্যবহারিক" এবং *অর্থশাস্ত্র*-এ, 'পৌর ব্যবহারিক' বলা হয়েছে রজুকগণ গ্রামাঞ্চলে বিচার করতেন। অশোকের লেখতে এঁদের কথা পাওয়া যায়। গ্রীক লেখকেরা বিদেশীদের জন্য পৃথক বিচারকের কথা বলেছেন। *অর্থশাস্ত্র*-এ ধর্মীয়-দেওয়ানি আদালতের সঙ্গে ফৌজদারি আদালতের পার্থক্য করা হয়েছে। প্রথমটিকে "ধর্মস্থির" এবং দ্বিতীয়টিকে "কণ্টকশোধন" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয়-দেওয়ানি আদালতের ধর্মস্থ এবং অমাত্যগণ বিচার করতেন। কিন্তু ফৌজদারি আদালতে সরকারি কর্মচারী, অমাত্যদেরই প্রাধান্য ছিল।

মেগাস্থিনিস এবং কৌটিল্য উভয়েই ফৌজদারি আইনের বিশেষ কঠোরতার কথা বলেছেন। সামান্য অপরাধে প্রভূত জরিমানা দিতে হত। শাস্তি হিসাবে কারাবাস এবং অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। জঘন্য অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। এই দণ্ডের প্রয়োগপদ্ধতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল। অপরাধীকে শূলে চড়ানো হত। কখনও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে ফেলা হত, কখনও বা তাকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হত। অবশ্য জরিমানা হিসাবে প্রচুর অর্থ দিলে, অপরাধীকে অঙ্গচ্ছেদ অথবা মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়া হত। সাধারণত ব্রাহ্মণদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত না। কিন্তু কোন ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ প্রমাণিত হলে, তাঁকে এই দণ্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়া হত না। তখন তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে, জলে ডুবিয়ে মারা হত। অশোক, তাঁর মানবিকতা সত্ত্বেও মৃত্যুদণ্ড রহিত করেন নি। তবে তিনি ফৌজদারি আইনের কঠোরতা বহুলাংশে হ্রাস করেছিলেন।

মৌর্য রাজস্বের বেশিরভাগ আসত ভূমিকর (সীতা, ভাগ, বলি এবং কর) থেকে। ভূমিকর রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস হলেও, একমাত্র উৎস ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই উৎস ছিল বহুবিধ। দুইটি সাময়িক করের কথা প্রথমেই বলা যায়। একটি সেনাভক্তম, অন্যটি উৎসঙ্গ। প্রথমটি, আগুয়ান সেনাবাহিনীর ভরণপোষণের জন্য দিতে হত। দ্বিতীয়টি, রাজপুত্রের জন্ম হলে উপঢৌকন হিসাবে আসত। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে নানাভাবে কর আদায় করা হত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্যবসায়ী ব্যবসায়কিদের প্রতি রাষ্ট্রের মোটেই সদয় দৃষ্টি ছিল না। *অর্থশাস্ত্র*-এ ব্যবসায়ীদের "অচৌরশ্চোরঃ" (অর্থাৎ নামে না হলেও কার্যত চোর) বলা হয়েছে। আমদানি ও রপ্তানির উপর শুল্ক ধার্য করা হত। পণ্যের উপর সাধারণভাবে, যাতায়াতের পথে পণ্যের উপর বিশেষভাবে এবং বিক্রয়ের উপর কর ধার্য করা হত। বৃত্তিজীবী মানুষের উপর, সংঘ বা গিল্ডের সদস্যদের উপর কর চাপানো হত। শিল্প এবং কারিগরেরাও অব্যাহতি পেত না। গণিকা, জুয়ার আড্ডা, পানশালা এবং কষাইখানা রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যতম উৎস ছিল। রাষ্ট্র ঋণ হিসাবে অর্থ দিত। এখানে সুদ থেকেও আয় হত। শহরে যাদের নিজের বাড়ি ছিল, তাদের সেজন্য কর (বাস্তুক) দিতে হত। খেয়া পারাবার, জলসেচ ইত্যাদি থেকে রাজস্ব আসত। বিচারালয়ে ধার্য জরিমানা রাজকোষে জমা হত। কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না থাকলে, তা রাজার হাতে চলে যেত। গুপ্তধন পাওয়া গেলে, তার রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হত। জরুরী অবস্থায় বিশেষ কর আদায় করা হত। রাজকীয় জমি, বন এবং খনি ছিল রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। এই খনিই রাজকোষ পূর্ণ করত এবং স্থায়ী সৈন্যদল গঠন সম্ভব করেছিল। লবণ উৎপাদনে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার ছিল। আমদানি লবণের উপর সামান্য হারে শুল্ক

ধার্য করা হত। মুদ্রায় খাদ মেশানোর ফলেও রাষ্ট্রের আয় হত। বিষ্টি বা বেগার শ্রমকেও আয়ের অন্যতম উৎস বলা চলে।

সে যুগে রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে ব্যয় করা হত। তারা যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করত। পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদে কাষ্ঠবেষ্টনীও তারাই নির্মাণ করেছিল। বলাবাহুল্য, এই বেষ্টনী প্রাসাদটিকে সুরক্ষিত করেছিল। পশুপালক এবং শিকারীরা বন্য জন্তু হত্যা করে বিভিন্ন অঞ্চলকে বাসোপযোগী করত। এজন্য তারাও অর্থ পেত। মৌর্যযুগে শিক্ষা সংস্কৃতিকে অবহেলা করা হত না। তাই এর ধারক ও বাহক, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণকে অর্থ দেওয়া হত। ব্রাহ্মণ এবং শিক্ষিত ক্ষত্রিয়গণ অন্যভাবে রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভ করতেন। তাঁদের জমি দেওয়া হত। এই জমিকে ব্রহ্মদেও জমি বলা হত। অবশ্য এই ব্রহ্মদেও জমির পত্তন মৌর্য যুগে হয়নি। প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে মহাশালগণের উল্লেখ আছে। এঁরা নির্দিষ্ট গ্রামের রাজস্ব ভোগ করতেন। সম্ভবত উপনিষদের যুগে এঁদের উৎপত্তি হয়েছিল। এই মহাশালগণের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ। কিছু সংখ্যক শিক্ষিত ক্ষত্রিয়ও ছিলেন। যাঁরা ব্রহ্মদেও জমি ভোগ করতেন, শুধু তাঁদেরই কাছে এই জমি দান অথবা বিক্রয় করা যেত। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল এটা যে, যাঁরা শিক্ষাদান ভিন্ন অন্যভবে জীবিকা অর্জন করেন, তাঁদের হাতে যেন এই জমি না যায়। জলসেচ এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হত। জনকল্যাণমূলক কাজ বলতে প্রধানত পথঘাট নির্মাণ, কিছু দূর অন্তর বিশ্রামাগার স্থাপন, মানুষ এবং পশুর জন্য বিনা ব্যয়ে চিকিৎসাব্যবস্থা, ইত্যাদি বোঝাত। শিল্পসৌধ নির্মাণ এবং সংরক্ষণ, ধর্মপ্রচার ইত্যাদি কাজের জন্য অর্থ ব্যয় করা হত। গরিবদুঃখীকে সাহায্য দান, দুর্ভিক্ষজনিত দুর্দশা মোচন, কৃষিতে ভরতুকি প্রদান, হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হলে ক্ষতিপূরণ দান ইত্যাদিও রাষ্ট্রীয় কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য এইসব কাজের পক্ষে কোন শাসনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা ছিল না।

মৌর্য যুগে অব্রাহ্মণদের করভার বহন করতে হত। যুদ্ধ, ধর্মপ্রচার ও জনকল্যাণমূলক কাজে যে অর্থ ব্যয় করা হত, তার বেশিরভাগ আসত বিভিন্ন কর থেকে। সুতরাং করের বোঝা মোটেই হালকা ছিল না। এর সঙ্গে পরবর্তী মৌর্য শাসকদের রাজত্বকালে কর আদায়কারী কর্মচারীদের অত্যাচার যুক্ত হয়েছিল। অশোক এবং তার পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তার পিছনে দূষিত করব্যবস্থা অবশ্যই ইন্ধন যুগিয়েছিল।

সাধারণভাবে মৌর্য শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে রস্তফজেফের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গ্রীক জগতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় আমূল কেন্দ্রীকরণের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। এর দ্বারা তিনি ডেমিট্রায়স অথবা মিনান্দারের চাইতে বেশি আকারে ভারতকে গ্রীক অবয়ব দান করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক জগতের কাছে ঋণী হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর ঋণ ছিল পারস্যের আকেমিনীয় সাম্রাজ্যের কাছে। মৌর্যশাসন এবং মৌর্যশিল্পের মধ্যে একদিকে খুব মিল ছিল। দুই-ই ছিল বাক্যের মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট, কিন্তু ব্যাকরণগত সম্পর্কহীন অংশের মতো। দুই-ই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অগ্রগতির ধারাটিকে ব্যাহত করেছিল। এই শাসনকাঠামোর বহিরাগত উপাদানগুলি সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছিল সত্য, কিন্তু সাময়িকভাবে এগুলি বৃহৎ সাফল্য অর্জন করেছিল।

মৌর্য শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ডঃ রায়চৌধুরীর মন্তব্য উদ্ধৃত করে আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করতে পারি।

তিনি বলেছেন, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* আমাদের সামনে একটি ক্ষমাহীন ব্যবস্থা উদ্‌ঘাটিত করে। কৌটিল্য বর্ণিত সম্রাট, সেনাবাহিনী, গুপ্তচরব্যবস্থা প্রভৃতি নির্মমতা ও দুর্লভ নৈপুণ্যের প্রতীক বলে মনে হয়। তবুও একথা স্বীকার্য যে, এই প্রায় সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যর অগ্রসর করেছিল, এবং এখানে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক সহিষ্ণুতা ও ঔদার্যের বৃহত্তম আদর্শের দ্বারা বিধৃত ছিল। অশোকের লেখতে আছে, "সকল মানুষই আমার সন্তান।" কৌটিল্যের নীতি, এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি। রাজা সম্পর্কে কৌটিল্য বলেছেন, "প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজার কল্যাণে রাজার কল্যাণ। রাজার যা ভালো লাগে, তিনি তা ভালো মনে করবেন না, প্রজার যা ভালো লাগে, তিনি তাই ভালো মনে করবেন।"

৩খ.৩ বিন্দুসার (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-২৭৩ অব্দ)

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার সিংহাসনে বসেন। অশোকের অষ্টম শিলালেখ (কালসি ভাষ্য) থেকে জানা যায় যে তিনিও নিজেকে "দেবানাং পিয়" বলে অবিহিত করতেন।

বৌদ্ধ গ্রন্থ *আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প,* তারানাথ এবং হেমচন্দ্রের রচনা থেকে জানা যায় যে চাণক্য তাঁর রাজত্বকালেও কয়েক বছর মন্ত্রীপদে ছিলেন। তারানাথ লিখেছেন যে, চাণক্য ষোলোটি শহরের রাজা ও অভিজাতদের ধ্বংস করেছিলেন। এর ফলে পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল বিন্দুসারের অধিকারে এসেছিল। এ থেকে ভিনসেন্ট স্মিথ মনে করেন যে, বিন্দুসার দাক্ষিণাত্য তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই তো মৌর্য সাম্রাজ্য সুরাষ্ট্র থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাই তাঁর মতে তারানাথের বক্তব্যকে সাধারণ বিদ্রোহ দমনের চেয়ে ব্যাপকতর অর্থে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না। *দিব্যবদানে* আছে যে, বিন্দুসারের সময় তক্ষশিলা বিদ্রোহ করেছিল এবং তিনি পুত্র অশোককে সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বিদ্রোহীরা অশোকের কাছে বলেছিলেন "দুষ্ট অমাত্যগণ আমাদের অপমান করে।"

বিন্দুসার পাশ্চাত্যে গ্রীক শাসকদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করেছিলেন। স্ট্রাবো লিখেছেন যে, সিরিয়ার রাজা মেগাস্থিনিসের পরে ডাইমাকসকে পাটলিপুত্রে পাঠিয়েছিলেন। প্লিনি লিখেছেন যে, মিশরের সম্রাট টলেমি ফিলাডেলফস (খ্রিস্টপূর্ব ২৮৫-২৪৭ অব্দ) ডায়োনিসিয়স নামে জনৈক দূতকে পাটলিপুত্রে পাঠিয়েছিলেন। তবে তিনি বিন্দুসারের সময় এসেছিলেন, না অশোকের সময় প্লিনি তা স্পষ্ট বলেন নি। এথেনায়স রাজা সিরিয়ার প্রথম এ্যান্টিওকস এবং বিন্দুসারের মধ্যে পত্র বিনিময়ের কথা বলেছেন। এইসব ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিন্দুসার তাঁর সমসাময়িক গ্রীক রাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করেছিলেন।

বিন্দুসারের যখন মৃত্যু হয়, তখন প্রায় সমগ্র উপমহাদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ভারতের সুদূর দক্ষিণ অঞ্চল এই সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের কোন প্রয়োজন ছিল না। পূর্বভারতের কলিঙ্গ অঞ্চলই তখন পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করত। অশোক তাই কলিঙ্গের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন।

৩খ.৪ অশোক (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ)

হুইলার তাঁর *এনসেন্ট ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান* গ্রন্থে অশোক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : আধ্যাত্মিক এবং বাস্তব দিক থেকে অশোকের রাজত্বেই ভারতীয় মনের প্রথম সুসঙ্গত প্রকাশ দেখা যায়। তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পরে অনেক শতাব্দী ধরে তাঁর কাজ ভারতীয় চিন্তায় ও শিল্পে অন্তর্লীন হয়েছিল। আজও তার মৃত্যু হয়নি।

অশোকের ইতিহাস আলোচনার জন্য আমাদের সাহিত্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। সাহিত্য বলতে বিশেষত *দিব্যবদান* এবং *সিংহলী* ইতিবৃত্ত বোঝায়। অশোক-ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এই সাহিত্যের স্থান নেহাতই গৌণ।

তুলনায় অশোকের লেখগুলি অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য। এগুলিতে অশোকের নিজের কথা চিরকালের জন্য বিধৃত হয়ে আছে। যে-সব প্রাচীন ভারতীয় লেখের পাঠোদ্ধার এ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে, অশোকলেখ তাদের মধ্যে প্রাচীনতম। অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই লেখগুলি প্রকাশ করেছিলেন এমন মনে করা ঠিক নয়। কেননা, তিনি অন্য ধর্মের প্রতিও উদার মনোভাব দেখিয়েছিলেন। অশোকের নামাঙ্কিত না হলেও তাঁর প্রতীক সম্ভবলিত মুদ্রা পাওয়া গেছে এবং অধুনা তাদের সনাক্তকরণও সম্ভব হয়েছে।

অশোকের লেখগুলি গিরিগাত্রে, স্তম্ভের উপর এবং গুহার অভ্যন্তরে পাওয়া গেছে। তাই এগুলিকে যথাক্রমে শিলালেখ, স্তম্ভলেখ এবং গুহালেখ বলা হয়। শিলালেখ এবং স্তম্ভলেখকে আবার প্রধান ও অপ্রধান, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রধান লেখগুলি বিশদ, অপ্রধান লেখগুলির তুলনায় সংক্ষিপ্ত। সুতরাং সম্রাট অশোকের লেখ পাঁচ প্রকারের—প্রধান শিলালেখ, অপ্রধান শিলালেখ, প্রধান স্তম্ভলেখ, অপ্রধান স্তম্ভলেখ এবং গুহালেখ।

ভারতের ইতিহাসে অশোকই প্রথম সম্রাট, যিনি তাঁর আদর্শ এবং কৃতিত্ব এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। চিন্তায় ও কার্যে তদানীন্তর ভারতের নিকট প্রতিবেশী পারস্যে অকিমেনীয় বংশের সম্রাট প্রথম দাররবৌষ অনুরূপ লেখ প্রচার করেছিলেন। দুইজনের লেখতেই মুখবন্ধ প্রায় একই রকমের।

৩খ.৪.১ কলিঙ্গ যুদ্ধ

বিন্দুসারের মৃত্যু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ সালে, কিন্তু অশোকের রাজ্যাভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল চার বছর পরে খ্রিস্টপূর্ব ২৬৯ অব্দে। দুইটি ঘটনার মধ্যে এই ব্যবধান কেন ঘটেছিল, তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। *সিংহলী ইতিবৃত্ত* অনুসারে ভ্রাতৃবিরোধের জন্য অশোকের অভিষেক বিলম্বিত হয়েছিল। কিন্তু অন্য কোন ঐতিহাসিক উপাদানে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় না।

অশোকের রাজত্বকালে রাজনৈতিক দিক থেকে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কলিঙ্গ জয়। অশোক তাঁর রাজত্বের শুরুতে মৌর্যদের চিরাচরিত সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করেন এবং তাঁর অভিষেকের আট বছর পরে খ্রিস্টপূর্ব ২৬১ অব্দে কলিঙ্গ জয় করেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে *সিংহলী ইতিবৃত্ত*-এ এই ঘটনার কোন উল্লেখ নেই।

কলিঙ্গ জয় অশোকের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়েছিল কেন? প্লিনি বলেছেন যে কলিঙ্গ নন্দসাম্রাজ্যের অংশ ছিল। সুতরাং অনুমান করা চলে যে, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে কলিঙ্গ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। তাই অশোকের পক্ষে হয়তো কলিঙ্গ জয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

অনেকে মনে করেন যে, তিব্বতের বিবরণে এই যুদ্ধের প্রকৃত কারণের আভাষ পাওয়া যায়। অশোক দক্ষিণ ভারতে প্রবেশের স্থলপথ এবং সমুদ্রপথ দুই-ই নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। কলিঙ্গ তাঁর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই অশোকের কলিঙ্গ জয় না করে উপায় ছিল না।

অশোকের পক্ষে কলিঙ্গ যুদ্ধে জয়লাভ করা সহজ হয়নি। ত্রয়োদশ শিলালেখতে এই যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার মধ্যেই এই সত্য প্রকটিত হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধে দেড় লক্ষ লোক বন্দী হয়েছিল, এক লক্ষ মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেছিল এবং এর অনেক গুণ বেশি মানুষ অন্যভাবে প্রাণ দিয়েছিল।

ডাঃ রায়চৌধুরী এই বিরাট ক্ষয়ক্ষতিকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই পঞ্চাশ বৎসরে কলিঙ্গের লোকবল হয়তো বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিংবা হয়তো হতাহতের সংখ্যা শুধু যোদ্ধারাই নয়, যারা যুদ্ধ করেনি, তারাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ডঃ ভাণ্ডারকর মনে করেন, এটা খুবই সম্ভব যে, কলিঙ্গ এই যুদ্ধে নিঃসঙ্গ ছিল না। চোল এবং পাণ্ড্যগণ হয়তো কলিঙ্গের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তাই হতাহতের সংখ্যা কলিঙ্গের সামরিক শক্তির তুলনায় অনেক বেশি হয়েছিল।

এই যুদ্ধে পরাজয়ের পর কলিঙ্গের গৌরব ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল। কলিঙ্গ মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। এর রাজধানী ছিল তোসালী। অশোক এই যুদ্ধের পর দুইটি বিশেষ কলিঙ্গ-লেখ প্রকাশ করেন। তারই একটিতে তিনি ঘোষণা করেন "সকল মানুষই আমার সন্তান।"

কলিঙ্গ যুদ্ধ মৌর্যদের ইতিহাসে শেষ বৃহৎ যুদ্ধ। ঐতিহাসিকেরা এই যুদ্ধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, মগধ এবং মধ্য ভারতের ইতিহাসে এই যুদ্ধ নতুন পথের নির্দেশক। এর সঙ্গে সঙ্গে মগধের ইতিহাসে বিম্বিসারের অঙ্গ অধিকারের মধ্যে দিয়ে যে সম্প্রসারণ পর্বের সূচনা হয় তার অবসান ঘটে এবং শান্তির, সামাজিক প্রগতির, ধর্মপ্রচারের, রাজনৈতিক নিশ্চলতার এবং সামরিক অযোগ্যতার একটি নতুন যুগের অভ্যুদয় হয়। দিগ্বিজয়ের পর্ব শেষ হয়ে ধর্মবিজয়ের পর্ব শুরু হয়। অনেকে বলেছেন যে, এই যুদ্ধের পরে অশোক আর কোন আক্রমণত্মক যুদ্ধ করেননি, একথা সত্য। কিন্তু এর জন্য অশোক যা দাবি করেছেন তা সত্য নয়। তিনি যুদ্ধ করেননি, তার কারণ এ নয় যে তিনি যুদ্ধকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে বর্জন করেছিলেন, তার কারণ এই যে, এই যুদ্ধের কারণ মৌর্যসাম্রাজ্যের সংহতিসাধন সম্পূর্ণ হয়েছিল।

আর্থিক দিক থেকে গাঙ্গেয় অঞ্চল তখনও খুব সমৃদ্ধ ছিল সত্য। কিন্তু কোশম্বি বলেন যে, এই সমৃদ্ধি আর আগের মতো নিশ্চিত ছিল না। ধাতুর উপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার ক্রমশ কমে আসছিল। বিহারের তাম্রখনিগুলি জলসীমা স্পর্শ করেছিল। দাক্ষিণাত্যে লোহার নতুন উৎসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। অন্ধ্র এবং মহীশূরের লোহার খনিগুলির ব্যবহার তাই নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মগধের সীতা জমিতে যেভাবে স্থানান্তর থেকে লোক এনে বসতি স্থাপন করা হয়েছিল, দাক্ষিণাত্যের উৎকৃষ্ট জমি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকায় তা সম্ভব ছিল না। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করলে আর্থিক চিত্রটি খুব আকর্ষণীয় ছিল না। ক্রমবর্ধমান বসতি বিস্তারের জন্য স্বাভাবিকভাবে বনাঞ্চল হ্রাস পেয়েছিল। এর ফলে একদিকে যেমন বন্যা বেড়েছিল, তেমনই

অন্যদিকে জমিপিছু উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ক্রমশ কমে আসছিল। চন্দ্রগুপ্তের পরে কোষাগারের উপর যে চাপের সৃষ্টি হয়েছিল, তা তৎকালীন মুদ্রায় বিশেষভাবে পরিস্ফুট।

কোশাম্বি কলিঙ্গ যুদ্ধের পরবর্তী পরিবর্তনের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা এইভাবে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি পরিবর্তনকে অস্বীকার করেননি। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর "অশোক" গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম অশোকের চরিত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তিনি একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। অশোক তাঁর ত্রয়োদশ শিলালেখতে বলেছেন, "কলিঙ্গ জয়ের পরেই দেবানাং পিয় ধর্মের অনুসরণে, ধর্মের প্রেমে এবং বারংবার আবৃত্তি দ্বারা মানুষের মনে ধর্ম বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির কাজে বিশেষ উৎসাহী হয়েছিলেন।" তাঁর ধর্মমত পরিবর্তিত হয়েছিল এবং তিনি নিশ্চিতভাবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম অপ্রধান শিলালেখতে তিনি বলেছেন, "আড়াই বছর, বা তারও বেশিকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন থেকে আমি বুদ্ধ-শাক্য হয়েছি। এক বছর বা তার বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন থেকে আমি সঙ্ঘ পরিদর্শন করেছি এবং উৎসাহ দেখিয়েছি।" এইভাবে দেখা যায় যে কলিঙ্গ জয়ের পরে অশোকের সঙ্গে সঙ্ঘের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল এবং এর জন্য তিনি পরিশ্রম করতেও শুরু করেছিলেন। এক বছরেরও বেশি সময় (খ্রিস্টপূর্ব ২৬২-২৬০ অব্দ) কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি প্রথম অপ্রধান স্তম্ভলেখ প্রকাশ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০ অব্দে তিনি সম্ভবত বুদ্ধগয়া গিয়ে তাঁর ধর্মযাত্রা আরম্ভ করেন। এর পরে তিনি তাঁর চোদ্দোটি প্রধান শিলালেখ প্রকাশ করেন। এই লেখগুলিকে তাঁর ধর্মীয় ঘোষণা অথবা জনগণের কাছে তাঁর বাণী বলা যায়।

এই লেখগুলিতে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অশোকের আসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলির তাৎপর্য গভীরতর। এগুলি রাষ্ট্রনীতিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করে। অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণকে অনেকসময় রোমসম্রাট কাস্টান্টাইনের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কোশাম্বি মনে করেন, এই তুলনা সর্বাংশে সঙ্গত নয়। কেননা, এর ফলে রোমসাম্রাজ্যে খ্রিস্টধর্ম অন্য সব ধর্মের অবসান ঘটিয়েছিল। কিন্তু অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ফলে তেমন কোন অঘটন ভারতে ঘটেনি। কোশাম্বি বলেছেন, মৌলিক রূপান্তর ধর্মের ক্ষেত্রে ততটা নয়, যতটা ঘটেছিল জনগণের প্রতি ভারতীয় প্রথম পরিবর্তিত নীতিতে। অশোক তাঁর রাজকীয় কর্তব্যকে, জনগণের ঋণশোধ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মগধের প্রাচীনতম রাষ্ট্রদর্শে রাজা ছিলেন নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক। তার পাশে অশোকের নতুন আদর্শ বিস্ময়কর। *অর্থশাস্ত্র*-র রাজার কারও কাছে কোন দায় ছিল না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের লাভ এবং চরম লক্ষ্য ছিল যোগ্যতা। তার পাশে অশোকের এই দায়িত্বচেতনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বলা যায় এর ফলে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মগধের বিভিন্ন ধর্মের সমাজদর্শন অবশেষে তার রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিদ্ধ করেছিল। আমলাতন্ত্রের দ্বারা এবং আমলাতন্ত্রের জন্য পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান হয়েছিল।

৩খ.৪.২ অশোকের রাজ্যসীমা

কলিঙ্গ যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনার পর অশোকের সাম্রাজ্যসীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই সীমা-নির্ধারণের একটি সহজ উপায় হল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যসীমার সঙ্গে কলিঙ্গরাজ্য যোগ করা। সাধারণভাবে বলা যায় যে, পশ্চিমে সিরিয়া থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পর্যন্ত, উত্তরে কাশ্মীর থেকে পেন্নার নদী পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য প্রসারিত ছিল।

সাময়িকভাবে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের কথা মনে না রেখে, অশোকের সময়ে ঐতিহাসিক উপাদান থেকে স্বাধীনভাবে তাঁর সাম্রাজ্যের আয়তন স্থির করা চলে। এই উপাদান প্রধানত তিনটি ঃ (১) তাঁর শিলা ও স্তম্ভলেখগুলির ভৌগোলিক বণ্টন (২) তাঁর সময়ের স্থাপত্য নিদর্শন এবং (৩) দ্বিতীয়, পঞ্চম এবং ত্রয়োদশ শিলালেখর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য।

অশোকের বিভিন্ন লেখগুলি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথসমূহের সংযোগস্থলে অথবা সাম্রাজ্যশাসনের নতুন কেন্দ্রগুলিতে স্থাপিত হয়েছিল। কতকগুলি লেখ বুদ্ধের জীবনের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলি ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকায় ক্রমবর্ধমান বসতি বিস্তারের ফলে যে ভূভাগ অবহেলিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেই উত্তরাপথে। এই লেখগুলির প্রাপ্তিস্থান থেকে সাম্রাজ্যের বৃহৎ আয়তন সম্পর্কে ধারণা করা যায়। চতুর্দশ শিলালেখতে অশোক তাঁর সাম্রাজ্যকে "বৃহৎ" এবং পঞ্চম শিলালেখতে "সমগ্র পৃথিবী" বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর এই দাবি খুব অযৌক্তিক ছিল না।

অশোকের সময়ের স্থাপত্যও তাঁর সাম্রাজ্যের বৃহৎ আয়তনের ইঙ্গিত দেয়। কাশ্মীর ও নেপালের স্থাপত্য-ঐতিহ্য থেকে বলা যায় যে এই দুইটি অঞ্চল তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কহ্লণ এবং অশোকের রুমমিনদাই ও নিগলিসরাই স্তম্ভলেখ এই ধারণা সমর্থন করেন। হিউয়েন সাঙ যখন এসেছিলেন, তখন তিনি অশোকের তৈরি স্তূপ কপিশ (কাফিরিস্তান), নগর, (জেলালাবাদ) এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে উদ্যান নাম স্থানে দেখেছিলেন। হিউয়েন সাঙ-বর্ণিত তাম্রলিপ্তির অশোক-স্তূপ বঙ্গাদেশের উপর তাঁর অধিকারের আভাস দেয়। হিউয়েন সাঙ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে, সমতটে (ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপে) অশোকের স্তূপের কথা বলেছেন। তবে কামরূপ অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কি না, নিশ্চিত বলা যায় না। এ ছাড়া পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) এবং কর্ণসুবর্ণে (বর্ধমান, বীরভূম-মুর্শিদাবাদ অঞ্চল) অশোকের স্তূপের উল্লেখ তিনি করেছেন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে, চোল এবং দ্রাবিড় অঞ্চলে, অনুরূপ স্তূপের কথাও তাঁর বিবরণে পাওয়া যায়। এইভাবে দেখা যায় যে হিউয়েন সাঙ অশোকের স্তূপবণ্টনের যে বিবরণ দিয়েছেন তার সঙ্গে অশোকের লেখসমূহের বণ্টন, ভৌগোলিক দিক থেকে অনেকটা মিলে যায় এবং বলা যায় যে, লেখনলিও অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃত আয়তনের দলিল।

অশোকের দ্বিতীয়, পঞ্চম এবং ত্রয়োদশ শিলালেখ এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। এই লেখগুলিতে অশোকের সাম্রাজ্যের কিছসংখ্যক বহুদূরবর্তী প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দের উল্লেখ আছে, যেমন যোনগণ, গান্ধারগণ, নভকনভপংক্তিগণ, রাষ্ট্রিকগণ, ভোজগণ, অন্ধ্রগণ এবং পরিংদগণ।

অশোক 'অন্ত' অর্থাৎ তাঁর সাম্রাজ্যের সীমান্তের অব্যবহিত পরবর্তী অঞ্চলের রাজাদের কথা যা বলেছেন তাতেও তার সাম্রাজ্যের বাইরে, কিন্তু ভারতের ভিতরে। কতকগুলি ছিল অশোকের সাম্রাজ্যের বাইরে এবং ভারতেরও বাইরে। প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত রাজ্যগুলি ছিল চোলগণ, পাণ্ড্যগণ, কেরলপুত্র এবং সতিয়পুত্র। এখানে লক্ষণীয় যে কেরলপুত্র এবং সতিয়পুত্রের স্থলে একবচন এবং চোল ও পাণ্ড্যদের স্থলে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং চোল ও পাণ্ড্যরাজ্য, দুই-ই একাধিক ছিল। এইভাবে বলা যায় যে দক্ষিণ ভারতে অশোকের সাম্রাজ্য পেন্নার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেননা চোল, পাণ্ড্য ইত্যাদি যে চারটি স্বাধীন তামিল রাজ্যের কথা এখানে বলা হল, সেগুলি সবই ছিল পেন্নার নদীর দক্ষিণে।

ভারতের বাইরে, উত্তর-পশ্চিমে, যে অন্তরাজ্যের সঙ্গে অশোকের সাম্রাজ্যের সাধারণ সীমা ছিল, সেই রাজ্যটি সিরিয়া। অশোকের দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ শিলালেখতে যে সিরিয়ার রাজা অন্তিয়োকের উল্লেখ আছে, তিনি সেলুকাসের পৌত্র দ্বিতীয় এ্যান্টিওকাস। ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে, দ্বিতীয় এ্যান্টিওকাস হেরাতের পূর্বভাগে রাজত্ব করেছিলেন, এমন কথা যখন জানা যায় না, তখন অনুমান করা চলে যে, ইতিপূর্বে সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে যে অঞ্চলগুলি দিয়েছিলেন, সেই অঞ্চলগুলি তখনও মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডঃ রায়চৌধুরী এবং ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, উত্তর-পশ্চিমে অশোকের সাম্রাজ্য হিন্দুকুশ পর্বত বিস্তৃত ছিল এবং পরেই ছিল সিরিয়ার রাজা এ্যান্টিওকাসের রাজ্য। এইভাবে বিভিন্ন উপাদান থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে দাবি করা হয় যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসহ সমগ্র ভারত, কেবল দাক্ষিণাত্যে ১৪ ডিগ্রি অক্ষাংশের দক্ষিণস্থ ছাড়া, অশোক-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩খ.৪.৩ অশোকের শাসনব্যবস্থা

অশোকের শাসনব্যবস্থা কয়েকটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই নীতিগুলির অন্যতম ছিল কেন্দ্রীকরণের নীতি। অশোকের সময় মৌর্যশাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ছিল না। অর্থাৎ মৌর্যরাষ্ট্র অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের সমষ্টি ছিল না। একথা সত্য যে কিছুসংখ্যক উপজাতি তখনও সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অথবা সীমান্তে নিজেদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন রক্ষা করেছিল। *অর্থশাস্ত্রে* উপজাতি সঙ্ঘ হিসাবে ব্রিজি, কম্বোজ এবং পাঞ্চালগণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে ডঃ রোমিলা থাপার বলেছেন যে, এই সঙ্ঘগুলি আপন অধিকারে তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেনি। শুধুমাত্র মৌর্যরাষ্ট্র সংগঠনের পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টি না করা পর্যন্ত তাদের পৃথক অস্তিত্বের স্বীকৃতি ছিল। মৌর্যসাম্রাজ্য উপজাতি প্রজাতন্ত্রের উপর রাজতন্ত্রের জয় সূচিত করে। রাজা তখন শুধু আইনের রক্ষক ছিলেন না, আইনপ্রণেতাও ছিলেন। *অর্থশাস্ত্রে* এমন কথা বলা হয়েছে যে, চিরাচরিত বিধানের সঙ্গে রাজকীয় আইনের বিরোধ ঘটলে, রাজকীয় আইনই কার্যকর হবে। এই নির্দেশ নিঃসন্দেহে রাজশক্তি প্রাধান্যের পরিচায়ক। ডঃ থাপার মনে করেন যে, অশোক পুরোহিততন্ত্রকে উপেক্ষা করে রাজশক্তির সঙ্গে দৈবশক্তির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি দেবানাং পিয়' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন।

আইন ও রাজনীতির দিক থেকে অশোকের শাসনব্যবস্থা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ছিল। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, অশোকের রাজতন্ত্র স্বেচ্ছাচারের নামান্তর ছিল না। জনগণের সম্পর্কে অশোকের নৈতিক দায়িত্ববোধ তাঁর স্বেচ্ছাচারকে নিয়ন্ত্রিত করত। তাছাড়া, তাঁদের মতে অশোক আইনের রক্ষক মাত্র ছিলেন, আইনপ্রণেতা ছিলেন না। কিন্তু এই মত পুরোপুরি সত্য বলে মনে হয় না। অন্তত অশোকের অনুশাসনগুলি এই মতকে খণ্ডন করে।

অশোকের শাসনব্যবস্থা নিঃসন্দেহে পিতৃত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বিতীয় কলিঙ্গ-লেখতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে তিনি বলেছেন, "সকল মানুই আমার সন্তান। আমি যেমন আমার সন্তানদের জন্য ইহলোকে এবং পরলোকে সমৃদ্ধি এবং আনন্দ কামনা করি, সব মানুষের জন্য আমি তাই করি"। এই নৈতিক দায়িত্ববোধ তিনি শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি, সকল কর্মীদের মধ্যে তিনি একে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। চতুর্থ স্তম্ভলেখতে তিনি তাঁর কর্মচারীদের দক্ষ ধাত্রীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, বলেছেন, একজন মানুষ যেমন তার শিশুসন্তানকে দক্ষ ধাত্রীর হাতে অর্পণ করে তিনিও তাঁর প্রজাদের তেমনই তাঁর কর্মচারীদের হাতে অর্পণ

করেছেন। অনেকে বলেছেন, এই শাসনব্যবস্থা উপরের দিকে স্বৈরাচারী হলেও, নিচের দিকে তা ছিল না। সেখানে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল।

কোশাম্বি অশোকের অনুশাসনগুলিকে সাংবিধানিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তিনি বলেছেন যে, এদের মধ্যে রাজশক্তির উপর প্রথম সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণের, জনগণের প্রথম 'অধিকারের সনদের' আভাস পাওয়া যায়। অশোক তাঁর কর্মচারীদের এই অনুশাসনগুলি বৃহৎ জনসভায় বৎসরে তিনবার যত্ন সহকারে পাঠ ও ব্যাখ্যা করার যে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন তা এই ইঙ্গিতই বহন করে।

কোশাম্বি বলেছেন যে, *অর্থশাস্ত্র*-এ রাজকীয় কর্মসূচী অবহেলিত হয়েছিল। অশোক তাকে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন এবং ইতিপূর্বে এই অবহেলার ফলে সময়ের দিক থেকে যে ক্ষতি হয়েছিল, কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়ে তিনি তার পূরণ করতে চেয়েছিলেন।

তিনি তাঁর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের (যেমন যুক্ত, রজুক, প্রাদেশিক ইত্যাদি) প্রতি পাঁচ বছর অথবা তিন বছর অন্তর অনুরূপ রাজ্য প্রদক্ষিণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কোশাম্বি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, অশোকের জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর ফলে রাজ্যে অর্থের প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রজাদের প্রতি অশোকের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাণিজ্যপথের ধারে নতুন বিশ্রামাগার ইত্যাদি স্থাপনের ফলে বাণিজ্যস্বার্থের উন্নতি ঘটায় অশোকের সময় মৌর্যরাষ্ট্রের একটি নিশ্চিত শ্রেণীভিত্তি রচিত হয়েছিল।

অশোকের তৃতীয় এবং ষষ্ঠ শিলালেখতে 'পরিষ' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শিলালেখতে বলা হয়েছে যে, রাজার কোন মৌখিক আদেশ অথবা মহামাত্রদের উপর অর্পিত কোন জরুরী দায়িত্ব অর্পণ বিষয়ে পরিষে (অর্থাৎ পরিষদে) কোন বিরোধিতা অথবা বিতর্কের সৃষ্টি হলে, প্রতিবেদকগণ তা তৎক্ষণাৎ রাজাকে জানাবেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মতো, অশোকের সময়ও এই সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। অশোকের লেখতে যুবরাজশাসিত চারটি প্রদেশের উল্লেখ আছে। এই প্রদেশগুলির রাজধানী ছিল যথাক্রমে তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, তোসালী এবং সুবর্ণগিরি।

সাধারণভাবে যুবরাজগণ দূরবর্তী প্রদেশসমূহের শাসক নিযুক্ত হলেও, মাঝে মাঝে এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটত। স্থানীয় নৃপতিগণ এই পদে নিযুক্ত হতেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পুষ্যগুপ্তের এবং অশোকের রাজত্বকালে যবনরাজ তুসাসফ নিযুক্ত হন। রাজধানীর নিকটবর্তী প্রদেশগুলি, প্রত্যক্ষভাবে সম্রাট কর্তৃক শাসকদের অধীনে থাকত। মনে হয় অশোক এই প্রদেশগুলি স্তম্ভলেখ দ্বারা এবং দূরবর্তী প্রদেশগুলি শিলালেখ দ্বারা চিহ্নিত করেছিলেন।

সবগুলি প্রদেশের সকল শাসক সমান স্বাধীনতা ভোগ করতেন না। মনে হয় তক্ষশিলা এবং উজ্জয়িনীর শাসকগণ অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করতেন। সে তুলনায় তোসালীর শাসকদের ক্ষমতা অনেক কম ছিল।

তৃতীয় শিলালেখতে অশোক যুক্ত, রজুক এবং প্রাদেশিক—এই তিন শ্রেণীর কর্মচারীর কথা বলেছেন। এই লেখরই শেষাংশে আছে যে যুক্তগণকে মহামাত্র পরিষদের নির্দেশে বিভিন্ন নিয়মাবলী নথিভুক্ত করতে হত। তাই Hultzch-এর মত অনুসারে এই যুক্তগণ মহামাত্রদের দপ্তরে রাজার আদেশ বিধিবদ্ধ করার কাজে নিযুক্ত সচিব ছিলেন।

চতুর্থ স্তম্ভলেখতে আছে যে রজুকগণ ছিলেন "অনেক শতসহস্র ব্যক্তির উপরে।" শাস্তি অথবা পুরস্কার প্রদানের সম্পূর্ণ অধিকার তাঁদের ছিল। বিচার ও দণ্ডের ক্ষেত্রে সাম্য (ব্যবহারসমতা ও দণ্ডসমতা) তাঁদের রক্ষা করতে হত। জনকল্যানমূলক কাজগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তাঁদের উপর ছিল। তাঁর জমি জরিপ, ভূমি ও জলসেচ ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। রজুকদের বিভিন্ন কার্যাবলী থেকে এটা স্পষ্ট যে, তাঁরা ছিলেন মৌর্যশাসনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। রজুকগণ উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, সন্দেহ নেই। তাঁদের কাজের বৈচিত্র ও গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে ডঃ রায়চৌধুরী তাঁদের স্ট্রাবোর 'এ্যাগ্রোনময়ের' সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন। ডাঃ ভাণ্ডারকদের মতে অশোক নগর-ব্যবহারক এবং প্রাদেশিকগণের বিচারসংক্রান্ত দায়িত্ব হরণ করে, বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রজুকদের উপর অর্পণ করেছিলেন। তাঁর এই ধারণা অতিরঞ্জিত মনে হয়। অশোক রজুকদের বিচার বিষয়ে বর্ধিত ক্ষমতা দিয়েছিলেন মাত্র। তাঁর এই কাজটি সঙ্গত হয়েছিল। তখনকার দিনে বেশিরভাগ মোকদ্দমাই ছিল জমি-সংক্রান্ত। এই ধরনের সব মোকদ্দমাই যদি প্রাদেশিকদের কাছে আনা হত, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বিশেষ চাপের সৃষ্টি হত। অশোক রজুকদের বিচারক্ষমতা বৃদ্ধি করে এই চাপ কমিয়েছিলেন। তাঁর এই কাজের পিছনে ঝুঁকি ছিল। এর ফলে রজুকগণের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার আশঙ্কা ছিল এবং অশোক এই ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

তৃতীয় শিলালেখতে প্রাদেশিকগণের উল্লেখ আছে। অনেকে প্রাদেশিকগণকে অর্থশাস্ত্রের "প্রদেষ্ট্রি"-র সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। তাঁদের মতে এঁরা কার্যনির্বাহী, রাজস্ব এবং বিচারবিভাগের প্রধান। আবার অনেকের মতে তাঁদের কাজ ছিল প্রদেষ্ট্রিগণের কাজের অনুরূপ। তাঁরা রাজস্ব আদায়ের তত্ত্বাবধান করতেন। গ্রামাঞ্চলে এবং জেলার শহরগুলিতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তাঁদের উপর ছিল। তৃতীয় শিলালেখতে তিন শ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখ, ছোট থেকে বড়, এইভাবে করা হয়েছে। তা যদি হয়, তাহলে প্রাদেশিকগণ রজুকদের চেয়ে উচ্চপদস্থ ছিলেন।

প্রথম কলিঙ্গ লেখতে নগরব্যবহারকের উল্লেখ আছে। অনেকের মতে, এঁরা ছিলেন পৌরশাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

অশোকের দ্বাদশ শিলালেখতে ধম্ম-মহামাত্য, ইতিঋক-মহামাত্য এবং বচভূমিক, এই তিন শ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখ আছে। ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিসাধন, যারা ধর্মের প্রতি অনুরক্ত, তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা, ধর্মমহামাত্রদের প্রধান কর্তব্য ছিল। যবনগণ, কম্বোজগণ, গান্ধারগণ এবং অন্যান্যদের মধ্যে যারা ধার্মিক, তারা যাতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি দিতে হত। তাঁদের দায়িত্ব শুধু ধর্মবিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। পঞ্চম শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, তাঁদের শাসন-বিষয়ক দায়িত্ব পালন করতে হত, বিশেষভাবে দিনমজুর, দুঃস্থ এবং বৃদ্ধদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁদের নজর দিতে হত। কয়েদীদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ, অথবা যাদের বড় পরিবার থাকত, মুক্তিমূল্যের বিনিময়ে এঁরা তাদের খালাস করে আনতেন। রাজপরিবারের দানকার্যকে এঁরা উৎসাহ দিতেন এবং দানের বণ্টনে সাহায্য করতেন। অশোক বলেছেন যে, তাঁর নিজের সংসারে, ভাই-বোনের সংসারে, রাজ্যের সর্বত্র তাঁরা ধর্মের জন্য কাজ করতেন। বাসাম বলেছেন যে, অশোক তাঁর বিভিন্ন সংস্কারকে কার্যকর করার জন্য ধর্মমহামাত্র পদের সৃষ্টি করেছিলেন। এঁরা ছিলেন অশোকের কেন্দ্রীকরণ নীতির হাতিয়ার।

ডঃ মুখোপাধ্যায় ইতিঋক-মহামাত্য বা স্ত্রী-অধ্যক্ষ মহামাত্যদের খুব ব্যাপক অর্থে নিয়েছেন। তাঁর মতে এঁরা নারীস্বার্থ রক্ষা করতেন। Hultzch এঁদের সঙ্গে কৌটিল্যের গণিকাধ্যক্ষের তুলনা করেছেন।

বচভূমিক অথবা ব্রজভূমিকগণ অশোকের জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী (কূপ, উদ্যান ইত্যাদি) এবং ধর্মপ্রচারের কাজে নিযুক্ত হতেন। এর পরে অন্তমহামাত্য নামক কর্মচারীদের কথা বলা চলে। অন্তমহামাত্য বলতে সম্ভবত বোঝাত সেই সব কর্মচারী, যাঁরা প্রতিবেশী অঞ্চলে অশোকের ধর্মবিজয়ের অথবা জনকল্যাণের নীতিকে কার্যকর করতেন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে যাঁরা অনুরূপ দায়িত্ব পালন করতেন, তাঁদের বলা হত 'পুরুষ'। ত্রয়োদশ লেখতে উল্লিখিত 'দূত'গণের কাজও ছিল অনেকটা একই ধরনের। অনেকের মতে তাঁরা বৈদেশিক সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। অনেকে বলেন যে, অশোক তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী ধর্মবিজয়ের নীতিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এঁদের দূর-বিদেশে পাঠাতেন।

আর দুই শ্রেণীর কর্মচারী, প্রতিবেদক এবং লিপিকারদের উল্লেখ করে এই বিবরণ শেষ করা যায়। প্রতিবেদকগণ ছিলেন সংবাদদাতা। ষষ্ঠ শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, যে-কোন সময় তাঁরা রাজার কাছে যেতে পারতেন। চতুর্দশ শিলালেখতে লিপিকারদের কথা বলা হয়েছে। তাঁদের প্রধান কাজ ছিল লিপিগুলি লেখা।

অশোকের শাসনব্যবস্থা-সম্পর্কিত আলোচনার শেষে তাঁর শাসন-বিষয়ক সংস্কারগুলি পুনরায় একসঙ্গে স্মরণ করা যায়। তিনি শাসনব্যবস্থায় নতুন 'পরাক্রমে'র প্রতিষ্ঠা, নতুন উৎসাহের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি এই ব্যবস্থাকে মানবতাবোধ উদারতা এবং জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তিনিই প্রথম সম্রাট, যিনি কল্যাণরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। একটি এককেন্দ্রিক শাসন-কাঠামোর মধ্যে তিনি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নীতিতে আংশিকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি যে বিচার-বিষয়ে রজুকদের স্বাধীনতাদান করেছিলেন, তা এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত করে। মন্ত্রিপরিষদের পৃথক অস্তিত্ব এবং গুরুত্ব তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার এই পরিষদের ছিল। এমনকি পরিষদ রাজার বিরোধিতাও করতে পারত। অশোক নিজে রাজ্য প্রদক্ষিণে যেতেন। তাঁর কর্মচারীদেরও যেতে বলতেন। তাঁর আগে এরকম কোন ব্যবস্থার কথা জানা যায়নি। ধর্মমহামাত্র নামক কর্মচারীপদ অশোকই প্রথম সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর এবং প্রতিবেদকগণের মধ্যে দূরত্বের অবসান ঘটিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে কোন সম্রাট এ কাজ করেননি। বিচারব্যবস্থায় তিনি দণ্ড ও ব্যবহারে সমতার প্রবর্তন করেছিলেন। মৃত্যুদণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত অপরাধীদের, দণ্ডাদেশ কার্যকর করার আগে তিন দিন পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ তিনি দিয়েছিলেন। তিনি এইভাবে ফৌজদারি দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস করতে চেয়েছিলেন। বিচারের নামে অবিচার বন্ধ করার জন্য তিনি দূরবর্তী প্রদেশগুলিতে মহামাত্র পাঠাতেন। প্রতি রাজ্যাভিষেক বার্ষিকীতে তিনি বন্দীদের মুক্তি দিতেন। তাঁর লেখ থেকে জানা যায় যে, ছাব্বিশ বৎসরে পঁচিশবার তিনি এই কাজ করেছিলেন।

আধুনিক দৃষ্টিতে অশোকের শাসনব্যবস্থার কয়েকটি ত্রুটি উল্লেখ করা যায়। ঘন ঘন রাজ্য প্রদক্ষিণ এবং গুপ্তচরব্যবস্থার মধ্যে একটি স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের স্বাদ পাওয়া যায়। এই শাসনব্যবস্থা ছিল প্রধানত কেন্দ্রাভিমুখী এবং অংশত স্থানিক। দৈনন্দিন কাজ সবই স্থানীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হত। কিন্তু নীতিনির্ধারণ করত কেন্দ্র। সমগ্র শাসন ছিল অতিমাত্রায় কেন্দ্রাভিমুখী। ভ্রাম্যমাণ মহামাত্র, প্রতিবেদক রাজপথ, দুর্গ, রাজার রাজ্য পরিদর্শন, এ সবই কেন্দ্রাভিমুখী শাসনব্যবস্থার উপাদান। এই রকম ব্যবস্থায় কোন সময় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব দুর্বল হলে,

তার ফলাফল দুর্ভাগ্যজনক হতে বাধ্য। শাসনব্যবস্থার এই অন্তর্লীন, দুর্বলতা অশোকের পরে মৌর্যসাম্রাজ্যের অবনতির জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। এই ব্যবস্থায় কর্মচারীদের আনুগত্য ছিল একান্তভাবে রাজার প্রতি। রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের কোন আনুগত্য ছিল না। ফলে তাঁরা রাজার ব্যক্তিগত কর্মচারীতে পরিণত হয়েছিল। রাজা-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদেরও পরিবর্তন হত। অশোকের পরে ঘন ঘন সিংহাসনে পরিবর্তনের ফলে এই ব্যবস্থা মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অশোকের শাসনব্যবস্থা কোন প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল না। বিচারবিভাগ এবং কার্যনির্বাহী বিভাগের মধ্যে কোন সীমারেখা ছিল না। এই ব্যবস্থা ছিল মাথাভারি এবং এতে সব ক্ষমতা মুষ্টিমেয়ের কুক্ষিগত ছিল।

৩খ.৪.৪ অশোকের ধম্ম

অশোকের ধম্ম সম্পর্কে তিনটি প্রশ্ন আলোচনা করা প্রয়োজন। এক, তিনি কখন এবং কেন এই ধম্ম গ্রহণ করেছিলেন, দুই, তাঁর এই ধম্মের স্বরূপ কী ছিল এবং তিন, তাঁর এই ধম্মকে বৌদ্ধধর্মের সমার্থক বলা যায় কিনা।

এটা নিশ্চিত যে অশোক তাঁর প্রজাদের দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ধর্মলেখ প্রচারের পূর্বে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সপ্তম স্তম্ভলেখতে তিনি বলেছেন যে, তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি ধর্মীয় অনুশাসনগুলি প্রচার করবেন এবং ধর্মশিক্ষা-দানের আদেশ দেবেন, যাতে ধর্মকথা শুনে মানুষ তা মেনে চলে, উন্নত হয় এবং ধর্মের পথে খানিকটা অগ্রসর হতে পারে। অশোক তাঁর রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে এই লেখগুলি প্রথম প্রকাশ করেন। তৃতীয় শিলালেখতে তিনি যুক্ত, রজুক এবং প্রাদেশিকগণকে, প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর, তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় ধর্মপ্রচারের এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে, পরিক্রমায় বের হওয়ার নির্দেশ দেন। পরের বছর, তিনি ধর্মমহামাত্র পদ সৃষ্টি করেন।

অশোকের ধর্মান্তর গ্রহণের কারণ হিসাবে সাধারণত কলিঙ্গ যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে দায়ী করা হয়। ত্রয়োদশ শিলালেখতে অশোক তাঁর এই অভিজ্ঞতা এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে কলিঙ্গ জয়ের জন্য তাঁর মনে অনুশোচনা হয়েছিল, কেননা কোন নতুন রাজ্য জয় করতে গেলে অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটে, অসংখ্য লোক আহত এবং বন্দী হয়। কলিঙ্গ যুদ্ধে যত লোক দুঃখ ভোগ করেছিল, তার শত ভাগের, এমনকি সহস্র ভাগের এক ভাগও যদি ভবিষ্যতে অনুরূপ দুঃখ ভোগ করে, তাহলে তা তাঁর কাছে গভীর দুঃখের কারণ হবে।

এই যুদ্ধের ভয়াবহতা অশোকের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল, তাঁর অন্তর পরিবর্তিত হয়েছিল এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় অপ্রধান শিলালেখতে এই তথ্য পাওয়া যায়। প্রথম অপ্রধান শিলালেখর একাংশে তিনি বলেছেন, "বৌদ্ধ সঙ্ঘ সন্দর্শনে য়াওয়ার এবং উৎসাহ প্রদর্শনের পর আড়াই বছর কেটে গেছে।" দ্বিতীয় অপ্রধান শিলালেখতে অশোক বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা এবং আস্থা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। এই দুইটি লেখ থেকে স্পষ্ট যে, অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

অশোক যে নিজেকে বৌদ্ধ মনে করতেন, তা তাঁর নির্মিত স্তূপ এবং প্রচারিত অনুশাসন থেকে নিশ্চিত জানা যায়। বৌদ্ধ ধর্মমতে অনৈক্য বিষয়ে একটি বিশেষ অনুশাসন তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘের উদ্দেশে প্রচার করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বৌদ্ধ সঙ্গীতির তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অশোক কেন এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তার গভীরতর সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা কোশাম্বি এবং ডঃ রোমিলা থাপারের রচনায় পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁদের এই ব্যাখ্যা অভ্রান্ত, এমন কথা বলা যায় না। কোশাম্বির মতে, অশোকের সময় মৌর্যরাষ্ট্রের একটি দৃঢ় শ্রেণীভিত্তি রচিত হয়েছিল। *অর্থশাস্ত্র*-র লেখককে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি, অশোককে তাই হতে হয়েছিল। এই সমস্যাটি ছিল বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের সংঘর্ষ এড়ানো। এই কাজে নতুন অর্থে এই বিশ্বজনীন ধম্ম অশোকের বিশেষ হাতিয়ার হয়েছিল। এই নতুন উন্নত ধম্মের মধ্যে রাজা এবং নাগরিক উভয়েই তাঁদের সাধারণ মিলনভূমি খুঁজে পেয়েছিলেন।

ডঃ থাপার তাঁর পূর্ববর্তী অনেকের বক্তব্য অনুসরণ করে এ বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মৌর্যযুগে আর্যসংস্কৃতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। পূর্বের আর্যসংস্কৃতি ছিল যাযাবর, পশুচারণভিত্তিক। নতুন আর্যসংস্কৃতি ছিল অপেক্ষাকৃত স্থির, নগরকেন্দ্রিক। এই নতুন নগরসংস্কৃতির জন্য সুনির্দিষ্ট সামাজিক সংগঠনের প্রয়োজন ছিল। মৌর্যযুগের সমাজ ছিল আগের তুলনায় অনেক জটিল এবং এই সমাজে বণিকশ্রেণী নতুন স্বীকৃতি লাভ করতে চেয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অনুসারে জাতিভেদ ব্যবস্থার কঠোরতা বৃদ্ধি করা ছিল এই সমস্যা সমাধানের উপায়। বৌদ্ধধর্মকে তার ব্যাপকতর সমাজ-সচেতনতা এবং কৃতকর্মের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব সমাধান মনে হয়েছিল। মৌর্যশাসন ছিল অতিমাত্রায় কেন্দ্রাভিমুখী। এই কেন্দ্রাভিমুখীনতার জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি উপাদানই (আমলাতন্ত্র, উন্নত যোগাযোগ এবং শক্তিশালী শাসক) তখন ছিল। অশোক এই প্রবণতাকে পুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সামনে দুইটি পথ খোলা ছিল। হয় তাঁকে কৌটিল্যের নির্মম নীতি, না হয় একটি নতুন ধর্মমত গ্রহণ করতে হত। এই ব্যবস্থায় অশোক দ্বিতীয় বিকল্পটি বেছে নিয়েছিলেন। বহু শতাব্দী পরে আকবরও তাই করেছিলেন। রাজনৈতিক দিক থেকে ধর্মমত গ্রহণ করে, অশোক, জনগণের যে অংশ উদার, গোঁড়ামিবর্জিত, তার সমর্থন লাভ করতে চেয়েছিলেন। এই অংশের পিছনে বণিকশ্রেণী থাকায়, এর সমর্থনের মূল্য অশোকের কাছে নেহাৎ কম ছিল না। সাংস্কৃতিক দিক থেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বহুতর বৈষম্য ছিল। তাই অশোক নতুন ধর্মমত গ্রহণ ও প্রচারের মধ্যে একটি প্রয়োজনীয় বন্ধনগ্রন্থি খুঁজে পেয়েছিলেন।

অশোক বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনি অন্য ধর্মমতকে বর্জন বা অগ্রাহ্য করেননি। সকল ধর্ম, ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি তিনি সমান সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর এই সহিষ্ণুতার দিকটি Hultzsch বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে ইউরোপের দৃষ্টান্ত থেকে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, অশোক ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করবেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। Hultzsch বলেছেন যে, হিন্দুরা সব সময়েই অন্য ধর্মের প্রতি চরম উদারতা দেখিয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেককে নিজ নিজ উপায়ে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে দিয়েছেন। তাঁদের ষড়্দর্শনের মধ্যে সর্বেশ্বরবাদী বেদান্ত এবং নিরীশ্বরবাদী সংখ্যা, দুই-ই আছে। সাহিত্য এবং বিভিন্ন লেখ থেকে জানা যায় যে, হিন্দু রাজারা অন্য ধর্মের দেবদেবীর জন্য মন্দির নির্মাণ এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাহায্যদান, তাঁদের কর্তব্য মনে করতেন। অশোক তাঁর আচরণে একই উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যে-কোন ধার্মিক হিন্দু রাজার মতো তিনি জনগণের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছিলেন। একই মনোভাব থেকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, সকল মানুষই তাঁর সন্তান। পঞ্চম শিলালেখতে তিনি ধর্মমহামাত্রদের ব্রাহ্মণ, ইভ (Hultzsch)-এর মতে বৈশ্য, ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণের পরে গৃহপতিগণ), সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থদের

নিয়ে ব্যস্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বৌদ্ধ, আজীবিক, নির্গ্রন্থ (জৈন) এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। সব সম্প্রদায়ের মানুষকে তিনি তাদের ইচ্ছামত যে-কোন স্থানে বসবাসের অধিকার দিয়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রতি উদার এবং ভদ্র আচরণের কথা বলেছিলেন। গুহালেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি আজীবিকদের মূল্যবান গুহা দান করেছিলেন। হুইলার মন্তব্য করেছেন যে, অশোক যে সহিষ্ণুতার বাণী প্রচার করতেন, এই দান তার বাস্তবতার সপ্রশংস সমর্থন। ষষ্ঠ স্তম্ভলেখতে তিনি ঘোষণা করেছেন "রাজা সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।" দ্বাদশ শিলালেখতে তিনি শুধু সব সম্প্রদায় সম্পর্কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দেননি, তাদের নিজেদের স্বার্থে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করার আহ্বান জানিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে, যে স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি আসক্তিবশত অথবা গৌরববৃদ্ধির জন্য নিজের সম্প্রদায়ের প্রশংসা করে, অথবা অন্য সম্প্রদায়কে দোষ দেয়, সে তার নিজের সম্প্রদায়েরই খুব ক্ষতি করে। তাই সেখানে তিনি সব সম্প্রদায়ের জন্য মৈত্রী এবং বাক-সংযমের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় শিলালেখতে, যেখানে তিনি তাঁর জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর কথা বলেছেন, সেখানেও তাঁর বিশেষভাবে বৌদ্ধ মনোভাবের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর এই ধরনের সব কাজেই ছিল সকলের জন্য। তিনি চেয়েছিলেন যে, সকলেই সব ধর্মের কথা জানুক এবং এইভাবে তারা 'বহুশ্রুত' হোক।

অশোকের ধর্ম ছিল সরল এবং ব্যবহারিক, জটিল এবং দার্শনিক নয়। বৌদ্ধধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তিনি জনসাধারণের ধর্মীয় আচরণের উপর বেশি জোর দিতেন। তাঁর একাধিক লেখ থেকে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণা কি ছিল, জানা যায়। একটি লেখতে তিনি বলেছেন, "পিতামাতাকে মান্য করতে হবে। সকল জীবের প্রতি অনুরূপ শ্রদ্ধা দাবি করতে হবে। সত্য অবশ্যই বলতে হবে।" আবার তৃতীয় শিলালেখতে তিনি বলেছেন, "পিতামাতার কথা শোনা পুণ্য কর্ম। বন্ধু, পরিচিত জন, আত্মীয়, ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদের প্রতি উদার আচরণ পুণ্য কর্ম। অল্প ব্যয়, এবং অল্প সঞ্চয় পুণ্য কর্ম।" এইভাবে দেখা যায় যে, অশোক কতকগুলি সাধারণ গুণের অনুশীলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। দ্বিতীয় এবং সপ্তম স্তম্ভলেখতে অশোক তাঁর ধম্মের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই গুণাবলী হল, দয়া, দান, সচে (সত্য), শোচয়ে (শুচিতা), মাদবে (ভদ্রতা), বহুকয়াণে (অনেক সৎ কাজ) এবং অপঅশিনব (চারিত্রিক কলুষতা থেকে মুক্তি)। এ ছাড়া চিন্তায় প্রকৃত উন্নতির জন্য আত্মসমীক্ষার প্রয়োজনের কথাও তিনি বলেছেন। উক্ত গুণাবলীর মধ্যে একমাত্র অপঅশিনব নঞর্থক, অন্যগুলি সদর্থক। তৃতীয় স্তম্ভলেখতে তিনি কোন প্রচণ্ড আবেগের ফলে, অশিনব, অর্থাৎ চারিত্রিক কলুষতার সৃষ্টি হয়, সে কথা বলেছেন। এই আবেগগুলি হল, ক্রোধ, নির্দয়তা, অত্যধিক আত্মগরিমা, হিংসা এবং হিংস্রতা। যাঁরা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করবেন, তাঁদের কর্তব্যকর্মের নির্দেশও অশোক দিয়েছেন। এগুলি হল, (১) অনারম্ভ প্রাণায়াম (প্রাণীহত্যা না করা), (২) অভিহিশ ভূতানাম (জীবিত প্রাণীর ক্ষতি না করা), (৩) পিতরি মাতরি শুশ্রূষা (পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা), (৪) থৈর শুশ্রূষা (বয়স্ক জনের প্রতি শ্রদ্ধা), (৫) গুরুনাম অপচিতি (গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা), (৬) ভৃত্য এবং ক্রীতদাসের প্রতিও ভদ্র আচরণ এবং (৭) অপব্যয়তা, অপভাণ্ডাত্য (অল্প ব্যয় এবং সঞ্চয়)।

অশোক তাঁর ধর্মের স্বরূপ প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তার সঙ্গে ধম্মপাদে-বর্ণিত বৌদ্ধনীতিবোধের বিশেষ মিল দেখা যায়। অশোক ধর্মের যে বর্ণনা অথবা সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, ধর্ম তাঁর কাছে ছিল

নৈতিক কর্তব্যের সমষ্টি। তাঁর লেখতে যে ধর্মীয় ভাব এবং ভাষা দেখা যায় তাকে কোনমতেই ব্যক্তিগত চিন্তা এবং বিশ্বাসের প্রকাশ মনে করা চলে না। ধম্মপদের অনুরূপ ভাব এবং ভাষা থেকে, একটিকে অন্যটির পরিপূরক বলে মনে হয়।

অশোক মাসকি লেখতে 'ধম্ম' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ব্রহ্মগিরি লেখর দ্বিতীয়াংশে তিনি এর সংজ্ঞা নির্দেশ করেন। অন্যান্য অনেক লেখতে তিনি ধম্মকে ব্যাখ্যা করেন। সপ্তম স্তম্ভলেখতে তাঁর এই প্রয়াস চরম পরিণতি লাভ করে। সেখানে তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদের প্রতি, দরিদ্র ও দুঃস্থদের প্রতি, এমন কি ভৃত্য এবং ক্রীতদাসদের প্রতিও উদার আচরণের কথা বলেছেন। এই লেখতে ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদের প্রতি অশোকের সমদৃষ্টি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বৌদ্ধ গ্রন্থ ধম্মপাদেও অনুরূপ আচরণের কথা বলা হয়েছে।

অবশ্য অশোক তাঁর দুইটি লেখতে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠানের নিন্দা করেছেন। নবম শিলালেখতে তিনি, মহিলাগণ বিভিন্ন সময়, যেমন অসুখ হলে, পুত্র-কন্যার বিবাহে, পুত্রের জন্ম হলে, কিংবা যাত্রারম্ভকালে, যেসব স্থূল আপত্তিজনক অনুষ্ঠানাদি করে থাকেন, তার নিন্দা করেছেন এবং পরিবর্তে, নৈতিক আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি যজ্ঞে পশুবলি সরাসরি নিষিদ্ধ করেছেন। পশুবলির মতো আপত্তিকর সমাজ-অনুষ্ঠানও তিনি নিষিদ্ধ করেন। পরিবর্তে, চতুর্থ শিলালেখতে তিনি মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিমূলক দৃশ্যাদি দেখানোর কথা বলেছেন। এই লেখতে অশোক মন্তব্য করেছেন যে, যে ব্যক্তির আচরণ সৎ নয়, তার পক্ষে নৈতিক আচরণ সম্ভব নয়। তাই তিনি তাঁর বংশধরদের নীতি এবং সদাচার মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। ধম্মপাদের একটি উক্তির প্রতিধ্বনি শোনা যায় ('এখন আমার এই কু-কর্ম চিনতে পারা প্রকৃতই কঠিন')। অশোক তাঁর প্রথম দিকের ঘোষণায় প্রজাদের জন্য উৎসাহ বা পরাক্রমের কথা বলেছেন। ষষ্ঠ শিলালেখতে তিনি সাধারণের কাজের জন্য পরাক্রমের প্রয়োজনের কথা পুনরায় উচ্চারণ করেছেন। উত্থান, পরাক্রম এবং অপ্পমাদের (অপ্রমাদ অর্থাৎ শ্রচম) কথা ধম্মপাদেও আছে। একাদশ শিলালেখতে বলা হয়েছে যে, কোন দানই ধম্মদানের মতো নয়। আবার, সব দানের মধ্যে ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ, এই দাবী করেছেন। "চক্ষু" শব্দের এই ব্যবহার ধম্মপাদেও পাওয়া যায়। পরিশেষে অশোক বাহুবলে রাজ্যজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের কথা বলেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে, এই নীতি তাঁর প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে, এমনকি অরণ্য অঞ্চলে অধিবাসীদের মধ্যে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অশোকের ধর্মের সঙ্গে ধম্মপাদে-বর্ণিত বৌদ্ধ ধর্মমতের অমিল দেখা যায়। অশোকের লেখতে বৌদ্ধ নির্বাণতত্ত্বের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেখানে, ধর্মাচরণের জন্য ইহলোকে সুখ এবং পরলোকে শান্তি, এই হিন্দু বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়। পরলোকে 'সুখের' পরিবর্তে, অশোক অনেক জায়গায় 'স্বর্গ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ধম্মপাদে 'নির্বাণ' এবং স্বর্গের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

অশোকের ধম্মকে *অর্থশাস্ত্র*-র কঠোর রাজনৈতিক তন্ত্রের পরিপূরক বলা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ধম্মকে সমাজ-বিন্যাস-বিধান হিসাবে দেখা মৌর্যভারতে নতুন ছিল না। অর্থাৎ এ ধারণা আগেও ছিল। অশোক এই ধারণাকে মানবিক করে তুলতে চেয়েছিলেন, তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, যা সত্যই গুরুত্বপূর্ণ, তা হল সৎ আচরণ। অশোকের ধম্ম ছিল প্রধানত একটি নৈতিক ধারণা এবং এই ধারণা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। এই ধম্মপ্রচারের মধ্য দিয়ে অশোক ধর্মীয় শিক্ষার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কার

সাধন করতে, বলবানের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র মানুষের উদার সামাজিক আচরণ সম্পর্কে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, কোন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীই যাতে তার বিরোধিতা করতে না পারে।

অশোক যে নীতিবোধ প্রচার করেছিলেন, তা শুধু বৌদ্ধধর্মের নয়, সকল ভারতীয় ধর্মেরই সাধারণ লক্ষণ। তাঁর প্রবর্তিত ধম্মে আর্য সত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, কার্যকারণ সম্পর্ক, বুদ্ধের অতি-প্রাকৃত গুণাবলী ইত্যাদির উল্লেখ নেই। এমনকি নির্বাণ চিন্তাও সেখানে অনুপস্থিত। তাই অশোকের ধম্ম প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্ম ছিল কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। রিস ডেভিডস বলতে চেয়েছেন যে, এই ধম্ম কোন ধর্ম ছিল না। প্রকৃত জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের যা করা উচিত, অশোক তাঁর 'ধম্মে' সেই কথাই বলেছেন। ডঃ ভাণ্ডারকর এই মত সমর্থন করেন না। তাঁর মতে অশোকের ধম্ম সকল ধর্মের সারবস্তু, অথবা কোন বিশ্বজনীন ধর্ম ছিল না। এটা পুরোপুরি বৌদ্ধধর্ম। অশোকের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধধর্মের রূপ ততটা প্রকট নয়, কেননা সেগুলির অধিকাংশ সাধারণ মানুষের, গৃহীভক্তদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। দ্বিতীয় অপ্রধান শিলালেখ (অথবা ভাব্রুলেখর) উল্লেখ করে তিনি তাঁর বক্তব্যকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন। এই লেখতে ধর্মশাস্ত্র-বিষয়ক যে গ্রন্থগুলি তিনি নির্বাচিত করেছেন, সেগুলি হল,—(১) *বিনয় সমুকাশ,* (২) *আলিয় বাস,* (৩) *অনাগত ভয়* (গুলি), (৪) *মুনিগাথা* (গুলি), (৫) *মোনেয় সুত্ত,* (৬) *উপতিস পসিন* এবং (৭) *লাঘুলবাদ*। যেহেতু এই শাস্ত্রগ্রন্থগুলি সবই কোন-না-কোন বৌদ্ধ সুত্তরূপে চিহ্নিত হয়েছে, সেইহেতু, ডঃ ভাণ্ডারকরের মতে, অশোকের ধম্ম যে বৌদ্ধধর্মের সমার্থক ছিল, এই সত্য মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত।

অনেকে এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, অশোক কখনও তাঁর ধম্ম এবং বুদ্ধের উপদেশকে এক করে দেখেননি। তারা অশোকের লেখগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এক শ্রেণীর লেখ তাদের মতে সাধারণ ঘোষণা এবং অপর শ্রেণী ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মতো। রুমামনদেই লেখ, গিলি সাগর লেখ, সারনাথের ধর্মীয় বিরোধসংক্রান্ত লেখ এবং ভাব্রু লেখ, তাঁদের মতে, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ভাব্রু লেখতে, অশোক যে বৌদ্ধ ছিলেন, সে কথা স্থিরকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এটি একটি ব্যক্তিগত লেখ এবং সাধারণের জন্য রচিত হয়নি। এটি একান্ত ও প্রত্যক্ষভাবে বৌদ্ধ সঙ্ঘের জন্য রচিত। তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে, অশোকের ধম্ম তাঁর রাষ্ট্রনীতির অংশ। সুতরাং তার স্বরূপ নির্ধারণের জন্য অশোকের ব্যক্তিগত লেখর উপর নির্ভর করা সঙ্গত নয়।

তাঁদের মতে অশোকের ধম্ম ছিল তাঁর স্বকীয় আবিষ্কার। এই ধম্ম হয়তো ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ভাবধারার কাছে ঋণী ছিল, কিন্তু মূলত এটি ছিল অশোকের পক্ষে, একটি ব্যবহারিক, সুবিধাজনক এবং নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সুস্থ জীবনযাপন পদ্ধতি নির্দেশের প্রয়াস। দার্শনিক তত্ত্বালোচনার সময় যাদের ছিল না, তাদের পক্ষে এটি ছিল একটি সুন্দর আপোষ-মীমাংসা। অশোকের ধম্মনীতি যদি শুধু বৌদ্ধনীতির লিপিবদ্ধকরণ হত, তাহলে তিনি সে কথা বলতেন, কেননা বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও সমর্থন তিনি গোপন করেন নি।

তাঁরা অশোকের দ্বৈত সত্তার কথা বলেছেন। একটি ছিল ব্যক্তিসত্তা, অন্যটি শাসকসত্তা। বৌদ্ধধর্ম ছিল ব্যক্তি অশোকের ধর্ম। শাসক হিসাবে অশোক বৌদ্ধধর্মের কয়েকটি দিককে তাঁর ভাবধারা প্রসারের উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি বৌদ্ধধর্মকে শুধু দর্শন হিসাবে দেখেন নি, তাকে

মানবগোষ্ঠীর পক্ষে সামাজিক এবং বুদ্ধিগত প্রেরণা রূপে দেখেছিলেন। তাঁদের মতে, অশোক এই উভয় সংকটের সমাধানকল্পে তাঁর ধম্মতত্ত্বের উদ্ভাবন করেছিলেন। এক কথায়, তাঁদের মতে ধর্ম এবং 'ধম্ম' সমার্থক ছিল না। অশোক ধম্ম সম্পর্কে বিশেষ ব্যস্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন। শেষদিকে এ তাঁর মনের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে ধম্ম ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট। তাই সামাজিক উত্তেজনা অথবা সাম্প্রদায়িক বিরোধ ধম্ম দূর করতে পারেনি। তবুও অশোকই প্রথম একটি নির্দেশক নীতির উদ্ভাবন করেছিলেন। তাই তিনি প্রশংসার যোগ্য।

৩খ.৫ অশোক-পরবর্তী মৌর্যগণ ও মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন

অশোকের মৃত্যুকে মৌর্য সাম্রাজ্যের ভাঙনের সঙ্কেত বলা চলে। সপ্তম স্তম্ভলেখতে অশোক দান প্রসঙ্গে "তাঁর পুত্রদের" এবং "অন্যান্য রাণীদের" পুত্রগণের কথা বলেছেন। এলাহাবাদে প্রাপ্ত রাণীর স্তম্ভলেখতে, তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী কারুবাকি এবং কারুবাকিপুত্র তিবরের নামোল্লেখ আছে। অশোকের অন্যান্য স্ত্রী এবং পুত্রদের কোন উল্লেখ তাঁর অপর কোন লেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর পুত্রসংখ্যা ছিল চার, মহেন্দ্র (অন্যমতে ভাই), তিবর, ধর্মবিবর্ধণ, অথবা কুণাল এবং জলৌকা। মহেন্দ্র ছিলেন দেবীর পুত্র, তিবর কারুবাকির, এবং কুণাল পদ্মাবতীর। জলৌকার মাতৃপরিচয় এখানে পাওয়া যায় না।

অশোক তাঁর পুত্রদের মধ্যে একমাত্র তিবর-এর নামোল্লেখ করেছেন। কিন্তু অশোকের মৃত্যুর পর তার নাম আর পাওয়া যায় না। সুতরাং মনে হয় যে, তিবরের অকালমৃত্যু হয়েছিল।

সাহিত্য উপাদানে তিবর ভিন্ন, মহেন্দ্র, কুণাল এবং জলৌকার উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে মহেন্দ্র কখনও সিংহাসনে বসেননি। সুতরাং সিংহাসনের প্রকৃত দাবিদার ছিলেন দুইজন, কুণাল এবং জলৌকা। *রাজতরঙ্গিনী* অনুসারে জলৌকা ছিলেন কাশ্মীরে এবং বৌদ্ধ উপাদান অনুসারে কুণাল ছিলেন পাটলিপুত্রে। *বায়ুপুরাণ* অনুসারে কুণাল আট বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু যেহেতু কুণাল অন্ধ ছিলেন সেইহেতু তাঁর রাজত্বকালে পাটলিপুত্রের প্রকৃত শাসক ছিলেন তাঁর পুত্র সম্প্রতি।

সাহিত্যে এবং লেখতে কুণালের উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী তথ্য পাওয়া যায়। উত্তরাধিকারীরূপে বায়ুপুরাণে বন্ধু পলিতের, জৈন-বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে সম্প্রতির এবং তারানাথের রচনায় বিগতাশোকের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু লেখতে দশরথের নামোল্লেখ আছে। ডঃ রায়চৌধুরী অনুমান করেন যে, হয়তো দশরথ এবং বন্ধুপলিত অভিন্ন ছিলেন।

কুণালের উত্তরাধিকারী হিসাবে দশরথ এবং সম্প্রতি প্রাধান্যলাভ করেন। ভিনসেন্ট স্মিথ মনে করেন যে, মৌর্য সাম্রাজ্য তখন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছিল। অধ্যাপক টমাসের মতে সম্প্রতির পরে মৌর্য সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়েছিল। কিন্তু এই বিভাগের প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্প্রতির পরে সালিসুখ পাটলিপুত্র শাসন করেছিলেন। *বিষ্ণুপুরাণ* এবং *গার্গীসংহিতা* থেকে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। তাঁর রাজত্বকালের মধ্যে এবং পরে বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ বিদ্রোহ করেন। *রাজতরঙ্গিণী* অনুসারে জলৌকা কাশ্মীরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সৈন্যসহ কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হন।

কিন্তু পাটলিপুত্রকে কেন্দ্র করে মৌর্য সাম্রাজ্য তখনও কোনমতে টিকে ছিল। সালিসুখ এবং বৃহদ্রথের মধ্যে কয়েকজন অকিঞ্চিৎকর রাজা রাজত্ব করেন। বৃহদ্রথ ছিলেন মৌর্যবংশের শেষ শাসক। পুরাণে এবং বাণভট্টের *হর্ষচরিত* -এ তাঁর উল্লেখ আছে। খ্রিস্টপূর্ব ১৮৭ অব্দে তিনি তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্তৃক নিহত হন। এইভাবে মাত্র ১৩৭ বৎসরেরক মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত মৌর্য সাম্রাজ্যের অবসান হয়।

৩খ.৫.১ মৌর্য সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন

খ্রিস্টপূর্ব ২৩২ অব্দে অশোকের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পঁচিশ বছরের মধ্যে গ্রীকগণ হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেছিল। এই হিন্দুকুশ পর্বত চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিমে মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমান্ত রচনা করেছিল। সুতরাং বলা যায় যে মৌর্যদের সে সামরিক শক্তি একদা আলেকজান্ডারের সেনাপতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, সেলুকাসের আক্রমণকে প্রতিহত করেছিল, তখন আর তা অক্ষুণ্ণ ছিল না। অর্থাৎ মৌর্য সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটেছিল। এই সাম্রাজ্য তখন পতনের পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্যের এই অবনতি ও পতন কেন ঘটেছিল, সে বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন কথা বলেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এজন্য ব্রাহ্মণ বিপ্লবকে দায়ী করেছিলেন। তাঁর মতে এই বিপ্লব সাম্রাজ্যের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করেছিল। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে-সব যুক্তির অবতারণা করেন, ডঃ রায়চৌধুরী একের পর এক সেগুলি খণ্ডন করেছেন।

ব্রাহ্মণ-অসন্তোষের কারণ হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয় অশোকের পশুবলিবিরোধী বিধানের কথা বলেছেন। তাঁর মতে এই বিধানের লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্মণশ্রেণী, এবং অশোক শূদ্রবংশজাত হওয়ায় এই শ্রেণীর অসন্তোষের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, পশুবলি নিষিদ্ধ হওয়ায় ব্রাহ্মণদের অসন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কেননা, অশোকের অনেক আগে ব্রাহ্মণগণ পবিত্র শ্রুতিতে অহিংসার পক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন। তাছাড়া মৌর্যগণ শূদ্রবংশজাত ছিলেন, এই ধারণাও ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। ডঃ রায়চৌধুরী বিষয়টি নতুন করে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে মহাপদ্মনন্দের পরে শূদ্রবংশের রাজারা রাজত্ব করবেন, এমন কথা পুরাণে আছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, মহাপদ্মের পরে সব রাজাই শূদ্র ছিলেন। কণ্বংশের রাজারা তো ব্রাহ্মণ ছিলেন। *মুদ্রারাক্ষস* নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে শূদ্র বলা হয়েছে। কিন্তু এই নাটকটি অনেক পরবর্তীকালের রচনা, তাই ততটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অধিকতর নির্ভরযোগ্য বৌদ্ধ উপাদানে *মহাপরিনির্বাণ-সুত্ত*-এ এবং *মহাবংশ*-এ, মৌর্যদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। *দিব্যবদান*-এ আছে যে, বিন্দুসার একটি মেয়েকে বলেছেন, "তুমি নাপিতের মেয়ে আর আমি ক্ষত্রিয় রাজা। তোমার সঙ্গে আমার মিলন কী করে সম্ভব?" অশোক রাণী তিষ্যরক্ষিতাকে বলেছেন "দেবী! আমি ক্ষত্রিয়! আমি কি করে পলাণ্ডু ভক্ষণ করব?" মহীশুরলেখতে, চন্দ্রগুপ্ত যে ক্ষত্রিয় ছিলেন তার আভাস আছে। 'অভিজাত' রাজার প্রতি কৌটিল্যের ঝোঁক দেখে মনে হয় যে তাঁর প্রভু চন্দ্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় ছিলেন।

এর পরে পণ্ডিত শাস্ত্রী অশোকের প্রথম অপ্রধান শিলালেখর পঞ্চম অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে, এই অংশের সেনার্টকৃত অনুবাদ গ্রহণ করেছেন। সেনার্টের অনুবাদে অশোক এখানে বলেছেন, এতদিন যাদের ভূদেব মনে করা হত, অশোক তাঁদের মিথ্যা দেবতা প্রতিপন্ন করেছিলেন। পণ্ডিত শাস্ত্রী বলেছেন যে, ব্রাহ্মণদের ভূদেব মনে করা হত। সুতরাং অশোক তাঁর এই ঘোষণা দ্বারা ব্রাহ্মণদের বিশেষ অসুবিধায়

ফেলেছিলেন। শিলালেখর এই অংশে যে শব্দটি বিতর্ক এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে সেটি হল 'অমিসাদেবা'। সেনার্ট 'মিস' শব্দটিকে সংস্কৃত 'মশা' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত করে, এর অর্থ করেছেন মিথ্যা। সিলভাঁ লেভি দেখিয়েছেন যে, এই লেখতে 'মিস' শব্দটি মিথ্যা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, 'মিশ্র' অর্থে হয়েছে। লেভির ব্যাখ্যা এখন সাধারণভাবে স্বীকৃত। এই ব্যাখ্যা অনুসারে সমগ্র অনুচ্ছেদটির বক্তব্য পরিবর্তিত হয়ে যা দাঁড়ায় তা হল, যারা এতদিন দেবতাদের সঙ্গে অমিশ্রিত ছিল, (অশোকের এক বছরের প্রচারকার্যের ফলে) তিনি তাদের দেবতাদের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়েছিলেন। অশোক এখানে কাউকে অসুবিধায় ফেলতে চাননি। শাস্ত্রীয় সমালোচনা তাই অসংগত মনে হয়।

পণ্ডিত শাস্ত্রী বলেছেন যে, অশোক ধর্মমহামাত্র পদ সৃষ্টি করে প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্মণদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এই অভিযোগের উত্তরে ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, ধর্মমহামাত্রগণ শুধু ধর্মবিষয়ক দায়িত্ব পালন করতেন না, তাঁদের শাসন-সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতে হত। ব্রাহ্মণদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন, তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। তাছাড়া তাঁরা যে শুধু অব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হতেন, এমনও কোন প্রমাণ নেই। অবশ্য ক্রমে তাঁরা এক ধরনের পুরোহিতে পরিণত হয়ে অশোকের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে ব্যর্থ করেছিলেন।

অশোকের বিরুদ্ধে অপর একটি অভিযোগ এই যে, তিনি দণ্ডসমতা এবং ব্যবহারসমতার উপর অত্যধিক জোর দিয়ে বিচারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করতেন, যেমন মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি, তাকে সঙ্কুচিত করেন। এ সম্পর্কে ডঃ রায়চৌধুরীর বক্তব্য এই যে, দণ্ডসমতা ও ব্যবহারসমতার প্রশ্নটি প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ঠিক হবে না। অশোক বিচারবিষয়ে রজুকদের স্বাধীনতা দান করেছিলেন। এর ফলে বিচারের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। এই সম্ভাবনা দূর করার জন্যই তিনি দণ্ডসমতা এবং ব্যবহারসমতার কথা বলেছিলেন। এর দ্বারা রজুকদের অধিকার সঙ্কুচিত হয়েছিল, ব্রাহ্মণদের হয়নি। তাছাড়া ব্রাহ্মণগণকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেত না, এই ধারণাও যথার্থ নয়। কৌটিল্য লিখেছেন যে, রাজদ্রোহের অপরাধ হলে, ব্রাহ্মণকে জলে ডুবিয়ে মারা হত।

পণ্ডিত শাস্ত্রী বলেছেন যে, অশোকের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণগণ তাঁর উত্তরাধিকারীদের বিরোধিতা করেছিলেন। ডঃ রায়চৌধুরী বলেন যে, এমন ধারণাও অমূলক। বরং ব্রাহ্মণ ঐতিহাসিক কহ্লণের রচনা থেকে জানা যায় যে, জলৌকার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

পরিশেষে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুষ্যমিত্র কর্তৃক বৃহদ্রথের হত্যার উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে ব্রাহ্মণদের হাত ছিল। ডঃ রায়চৌধুরী বলেন যে, শুঙ্গদের কালে রচিত ভারহুতে স্থাপত্য নিদর্শন থেকে মনে হয় না যে শুঙ্গগণ সংগ্রামী ব্রাহ্মণ্যবাদের নেতা ছিলেন। তাছাড়া পূষ্যমিত্র বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৮৭ অব্দে। কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন তার অনেক আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, *রাজতরঙ্গিণী*, তারানাথ এবং কালিদাস থেকে জানা যায় যে, কাশ্মীর, গান্ধার এবং বিদর্ভ, যথাক্রমে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। পলিবায়াস যে সুভগসেনের কথা বলেছেন, তিনি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দে উত্তর-পশ্চিম ভারতে স্বাধীন প্রতিষ্ঠা করেন।

সুতরাং, ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, মৌর্য সাম্রাজ্যের অবনতি এবং ভাঙ্গন পুষ্যমিত্রের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণবিপ্লবের ফলে ঘটেনি। তাহলে কি যবন-আক্রমণের ফলে এই ঘটনা ঘটেছিল? ঐতিহাসিক দিক থেকে

সেকথা বলা যায় না। কেননা এ্যান্টিয়োকাসের নেতৃত্বে প্রথম যবন-আক্রমণ অনুষ্ঠিত হয় খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দে। কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা আরও আগে হয়েছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য যাঁরা অশোককে দায়ী করেন, তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। তাঁরা বলেন যে, অশোকেগর নীতি বৌদ্ধদের সপক্ষে ছিল এবং তিনি ব্রাহ্মণবিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন। ডঃ রায়চৌধুরী এই অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন যে, অশোকের সাধারণ নীতি বৌদ্ধদের সপক্ষে, অথবা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ছিল না। দ্বিতীয়ত বলা হয় যে, দূরবর্তী প্রদেশসমূহের অমাত্যগণ অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন। এই অত্যাচারের জন্য বিন্দুসারের রাজত্বকালে তক্ষশিলা বিদ্রোহ করেছিল। অশোকের রাজত্বকালে তক্ষশিলা দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ করে। অশোক বিদ্রোহীদের শান্ত করার জন্য কুণালকে সেখানে পাঠান। বিদ্রোহীরা কুণালকে বলে যে, দুষ্ট অমাত্যগণ তাদের উপর অত্যাচার করেছেন। ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, পরবর্তীকালের রচনা *দিব্যবদান*-এ বর্ণিত অমাত্যগণের এই অত্যাচারকাহিনী অশোকের কলিঙ্গ-লেখ দ্বারা সমর্থিত হয়। এই লেখটি কলিঙ্গের রাজধানী তোসালীর মহামাত্রদের উদ্দেশে রচিত। এখানে অশোক বলেছেন, "সকল মানুষই আমার সন্তান। কিন্তু আপনারা এর (অর্থাৎ এই নীতির) সত্যতা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন না। ব্যক্তিবিশেষ হয়তো এই নীতি মেনে চলেন, কিন্তু তিনিও সম্পূর্ণভাবে মানেন না। আপনারা দেখবেন যেন শাসনকার্যে এই নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।" ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, কুশাসন শুধু কলিঙ্গেই ছিল না, তক্ষশীলা এবং উজ্জয়িনীতেও তা বিস্তৃত হয়েছিল। এই কুশাসনের ফলে বিভিন্ন মানুষের আনুগত্য ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছিল। অশোক প্রদেশ শাসনের এই ত্রুটি দূর করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পারেন নি, কেননা একাজে অমাত্যবর্গ তাঁকে সাহায্য করেননি। ডঃ রায়চৌধুরী বলেন যে, যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসীগণ বিন্দুসারের সময় অমাত্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল, তারাই প্রথমে মৌর্য সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ডঃ রোমিলা থাপার এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে প্রদেশগুলিতে অমাত্যদের অত্যাচার সম্পর্কিত ধারণা *দিব্যবদান*-এর দুইটি কাহিনীর উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট হয়েছে। এদের মধ্যে একটি কাহিনী অশোকের রাজত্বকালের পরে অযথা উদ্ভাবিত হয়েছে। তিনি বলেছেন অশোকের সময় অমাত্যদের অত্যাচারের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। প্রথম কলিঙ্গ-লেখ শুধুমাত্র তোসালীর মহামাত্রদের উদ্দেশে রচিত। এবং এখানেও অশোকের সুর যথেষ্ট কর্তৃত্বপূর্ণ। অন্যদিকে বলা যায় যে, তাহলে প্রজাদের অভিযোগ শোনার জন্য বিশেষ কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন কেন হয়েছিল।

অশোকের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ এই যে, কলিঙ্গ জয়ের পর তিনি একান্তভাবে শান্তিবাদী মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি অহিংসাকে নীতি হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে তিনি ধর্মবিজয়ের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। বিহারযাত্রার স্থলে ধর্মযাত্রার প্রবর্তন করেছিলেন। এর ফলে সেনাবাহিনী নিবীর্য হয়ে গিয়েছিল। তাঁর রাজত্বের শেষ ঊনত্রিশ বৎসর তাদের কিছু করণীয় ছিল না। কেননা অশোক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি ভেরিঘোষের পরিবর্তে ধম্মঘোষের প্রবর্তন করেছিলেন। ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে তখন যবন-আক্রমণের আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছিল। ভারতের ইতিহাসে তখন প্রয়োজন ছিল পুরুরাজ অথবা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মতো সামরিক শক্তিতে বিশ্বাসী একজন সম্রাটের। অশোকের মধ্যে ভারত একজন স্বপ্নদ্রষ্টাকে পেয়েছিলেন। সামরিক দিক থেকে এর ফল মারাত্মক হয়েছিল।

অনেকে এই মতের বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু একই দৃষ্টিকোণ থেকে তা করেননি। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমে কে. এ. এন. শাস্ত্রীর নামোল্লেখ করা যায়। তাঁর দৃষ্টিকোণ বিশেষ উন্নত। তিনি বলেছেন যে, যুদ্ধ করলেই একটি রাষ্ট্র শক্তিশালী হয় না। ঔরঙ্গজেব সারা জীবন যুদ্ধে ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু এর দ্বারা তিনি মুঘল সাম্রাজ্যকে দৃঢ়তর করতে পারেননি।

অন্যদিকে ডঃ রোমিলা থাপারের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি বলেছেন যে, অশোকের শান্তিবাদী মনোভাবকে অনেক সময় অতিরঞ্জিত করা হয়। অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে যতটা হাস্যকরভাবে সরল এবং শান্তিবাদীরূপে চিত্রিত করেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ততটা ছিলেন না। ডঃ থাপার তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেনঃ (১) অশোক যজ্ঞ এবং খাদ্যের জন্য পশুহত্যা অপছন্দ করতেন, কিন্তু তিনি খাদ্যের জন্য পশুহত্যা বন্ধ করেন নি, (২) তিনি মৃত্যুদণ্ডদান রহিত করেননি, (৩) সেনাবাহিনী ভেঙে দিয়ে তিনি অহিংসা নীতিতে নোঙর করেননি। অন্তত তাঁর লেখতে এর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সীমান্তের উপজাতিদের সম্পর্কে তাঁর নীতিতে যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি তাদের নিঃশর্তভাবে ক্ষমা করতে চাননি। বাসাম বলেছেন পূর্ববর্তী রাজারা তাদের ধ্বংস করার জন্য একের পর এক অভিযান চালিয়েছেন। অশোক তাদের সভ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা শান্তি বিঘ্নিত করলে, তিনি তাদের দমন করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ডঃ থাপার বলেছেন যে, অশোক অস্ত্র হিসাবে যুদ্ধকে বর্জন করেননি। তিনি শুধু বলেছেন যে, আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। রাজ্যজয়ের পরিকল্পনা যে তাঁর ছিল, কলিঙ্গ যুদ্ধেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাসাম বলেছেন, অশোক কলিঙ্গের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন, কিন্তু বিজিত রাজাকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেননি। তাঁর মতে, অশোক 'প্রতি ইঞ্চি রাজা' ছিলেন।

ডঃ রায়চৌধুরী অশোকের বিরুদ্ধে আর যে দুইটি অভিযোগ এনেছেন, তাদের যৌক্তিকতা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। তিনি বলেছেন যে, অশোক তাঁর ইতস্তত এবং ব্যাপক দানকার্যের দ্বারা মৌর্য-অর্থনীতিকে দুর্বল করেছিলেন। তাছাড়া তিনি রজুকগণকে স্বাধীনতা দান করে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। অশোকের পরবর্তী শাসকেরা দুর্বল ছিলেন। এই অশুভশক্তিকে দমন করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনটাই তাঁদের ছিল না। অশোকের বংশধরদের মধ্যে একমাত্র দশরথ ভিন্ন অন্য কেউ অশোকের ধম্মের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেননি। তাঁদের এই অযোগ্যতা মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল । তাঁরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্তৃক বৃহদ্রথের হত্যা, তারই প্রমাণ।

অশোকের অল্পকাল পরে মৌর্য সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে দশরথ রাজত্ব করতেন, পশ্চিমাংশে কুণাল। এই বিভাগের ফলে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ভেঙে যায়। এই পরিবর্তিত অবস্থায় পাটলিপুত্র পূর্বাঞ্চলে থাকায় তার কিছুটা সুবিধা হয়েছিল। পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে প্রাদেশিক রাজধানী তক্ষশীলাকে কেন্দ্র করে প্রায় সাম্রাজ্য-সংগঠন গড়ে তুলতে হয়েছিল। এই অঞ্চল তাই গ্রীক আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেনি।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় গণবিদ্রোহের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, এই বিদ্রোহ ছিল মৌর্যসম্রাটগণ কর্তৃক বিদেশী ভাবধারা গ্রহণ এবং অত্যধিক করভার আরোপের বিরুদ্ধে।

যারা এই মতের বিরোধিতা করেছেন, তাঁরা বলেছেন যে, মৌর্যযুগে করভার অতিরিক্ত ছিল না। পাটলিপুত্র এবং তার সংলগ্ন অঞ্চল ছিল সবচেয়ে উর্বর। কিন্তু মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অনুসারে সেখানে করের পরিমাণ ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ। তাছাড়া গণবিদ্রোহের জন্য যে জাতীয় চেতনার প্রয়োজন হয়, মৌর্যযুগে তার অস্তিত্ব ছিল না।

ডি. ডি. কোশাম্বি বলেছেন যে, অশোক-পরবর্তী শাসকদের সময় মৌর্য-অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি দুইটি তথ্যের উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, *অর্থশাস্ত্র* থেকে জানা যায় যে, তখন অভিনেতা, এমনকি গণিকাদের উপরও কর ধার্য হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তখনকার মুদ্রায় খাদ্যের পরিমাণ খুব বেড়েছিল। ডঃ রোমিলা থাপার একদা এই মতের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, মৌর্যযুগেই প্রথম করের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়। তাই তখন করযোগ্য সব কিছুর উপর কর ধার্য করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া যে দুইটি করের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি স্বাভাবিক কর ছিল, আপৎকালীন কর ছিল না। আর মুদ্রায় অতিরিক্ত খাদ নিয়ন্ত্রণশৈথিল্য অথবা উদ্বৃত্ত সম্পদ লুকিয়ে রাখার জন্য হতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে, হস্তিনাপুর এবং শিশুপালগড়ের স্থাপত্য-নিদর্শন বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির চিত্র মনে আনে। ভারহুত, সাঁচি, এবং দাক্ষিণাত্যের ভাস্কর্যকে একটি নতুন পরিশ্রমজীবি শ্রেণীর অভিব্যক্তি বলা চলে।

ডঃ রোমিলা থাপার পরে তাঁর মতের পরিবর্তন করেছেন এবং সাম্রাজ্যের পতনের জন্য সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণকে বড় করে দেখেছেন। মৌর্য-অর্থনীতির উপর কিছুটা চাপের সৃষ্টি হয়েছিল একথা তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, বৃহৎ সৈন্যদল, বেতনভুক কর্মচারী এবং নিত্যনতুন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের জন্য রাজকোষের উপর এই চাপের সৃষ্টি হয়েছিল। মৌর্যযুগের নগরসমূহে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক-নিদর্শন বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির আভাস দেয় সত্য, কিন্তু একমাত্র একেই নিশ্চিত প্রমাণ বলা যায় না। অন্যান্য অর্থনৈতিক উপাদানের কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। গাঙ্গেয় উপত্যকায় যদিও কৃষি-অর্থনীতি প্রাধান্য লাভ করেছিল, সাম্রাজ্যের সর্বত্র অর্থনীতির রূপরেখা এক ছিল না। রাজস্বের মধ্যেও তারতম্য ছিল। এই বৈষম হয়তো অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করেছিল। কৃষি এলাকা থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব হয়তো সমগ্র সাম্রাজ্যের ব্যয়ভার বহনের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না।

কোন সাম্রাজ্যের পক্ষে দুইটি বস্তু অপরিহার্য, একটি সুসংগঠিত শাসনব্যবস্থা, অন্যটি প্রজাপুঞ্জের রাজনৈতিক আনুগত্য। মৌর্য-শাসনব্যবস্থা ব্যবহারিক দিক থেকে সুসংগঠিত হলেও, তাতে একটি মারাত্মক ত্রুটি ছিল, যে জন্য তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। তাতে আমলাতন্ত্র ছিল অতিমাত্রায় কেন্দ্রাভিমুখী, সকল ক্ষমতার আধার ছিলেন রাজা, প্রজাদের আনুগত্য ছিল ব্যক্তিগতভাবে রাজার প্রতি। রাজা বদল হলে, আনুগত্যেরও পরিবর্তন ঘটত এবং তার চেয়েও খারাপ, রাজ-কর্মচারীগণও পরিবর্তিত হতেন। ইচ্ছামত কর্মচারীদের নিযুক্ত করা হত। রাজা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিযুক্ত করতেন, প্রাদেশিক শাসকগণ তাঁদের অধীনে কর্মচারীদের নিযুক্ত করতেন। শাসনক্ষমতা এইভাবে একই সামাজিক গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়েছিল। নিযুক্তি স্থানীয়ভাবে হওয়ায়, স্থানীয় দলাদলি স্থানীয় শাসনে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। জনমতকে স্থায়িত্ব দান করার মতো প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের অভাব আরও সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। মৌর্যদের গুপ্তচরব্যবস্থা নিশ্চয়ই রাজনীতিতে এবং শাসনকার্যে চাপা উত্তেজনার কারণ হয়েছিল। ডঃ থাপার বলেছেন যে, ভারতে গণরাজ্যগুলির অবনতির সঙ্গে রাষ্ট্রচেতনা ধীরে ধীরে নেপথ্যে চলে যায়। ধর্মীয় গোঁড়ামির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল রাজতন্ত্রশাসন ক্রমশ রাষ্ট্রচেতনাকে অস্পষ্ট করে তোলে।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে সমাজবন্ধনের প্রতি আনুগত্য গড়ে ওঠে। ডঃ থাপার এই সমাজবন্ধনকে 'ধর্ম' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ধীরে ধীরে রাষ্ট্রচেতনার স্থান নিয়েছিল এই ধর্ম।

তৎকালীন রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে মূর্ত স্তরে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন রাজা এবং সরকার এবং বিমূর্ত স্তরে, ধর্ম। রাজার দায়িত্ব ছিল এই ধর্মকে রক্ষা করা। এই ধর্ম বা সমাজবন্ধন খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হত। তাই এই পরিবর্তন মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যেত এবং এর প্রতি আনুগত্যের কোনপ্রকার শৈথিল্য ঘটত না। এই সমাজবন্ধনের পিছনে দৈব সমর্থন কল্পনা করা হত বলে একে রক্ষা করা পবিত্র কর্তব্য মনে করা হত। স্থানীয় পর্যায়ে সমাজবন্ধনের প্রতি আনুগত্যকে জাতিভেদব্যবস্থার মাধ্যমে সক্রিয় করা হত বলে, কোন বৃহত্তর ঐক্য গড়ে উঠতে পারত না।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের বিভিন্ন কারণ আলোচনা করে বলা যায় যে, অভ্যন্তরীণ কারণে এই সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে পতনের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। যবন-আক্রমণ এই পতনকে ত্বরান্বিত এবং পুষ্যমিত্রের হত্যাকাণ্ড তাকে সম্পূর্ণ করেছিল। প্রাচীন ভারতে প্রথম বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের পরীক্ষা এইভাবে শেষ হয়েছিল। ভবিষ্যতে অনুরূপ পরীক্ষা আরও হয়েছিল। কিন্তু তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঠিক আগের মতো ছিল না। তখন রাজা এবং প্রজার মধ্যে মধ্যস্থ হিসেবে এসেছিলেন কর্মচারী এবং ভূম্যধিকারীগণ। রাজা তাঁদের হাতে অনেক ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন। তাই পূর্বের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশ তখন আর তেমন জোরালো ছিল না। ক্রমশ পতিত-জমি উদ্ধার করার ফলে, অকর্ষিত অঞ্চল সঙ্কুচিত হয়েছিল। বিরাট সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রাজস্ব প্রাপ্তির নিশ্চয়তা হ্রাস পেয়েছিল। সাম্রাজ্য-বাসনা লুপ্ত হয়নি, কিন্তু প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপনের পিছনে যে বাধ্যবাধকতা এবং তীব্রতা ছিল, পরে তা ততটা ছিল না।

পরিশেষে বলা যায় যে, মৌর্যযুগে কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে ওঠেনি। রাষ্ট্রশাসনে জনসাধারণের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। সব কিছু একান্তভাবে রাজার শক্তি এবং ইচ্ছার উপর নির্ভর করত। অশোকের পরে সেই শক্তির অভাব ঘটেছিল। ব্রাহ্মণদের অসন্তোষও হয়তো মৌর্য সাম্রাজ্যকে দুর্বল করেছিল।

৩খ.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কীভাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

২। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যবিজয় সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

৪। অশোকের 'ধম্মে'-র মূল বৈশিষ্ট্য কী কী ছিল?

৫। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কি ব্রাহ্মণ্য বিদ্রোহই দায়ী ছিল?

৩খ.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। রণবীর চক্রবর্তী : *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*—আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৩৮ (বঙ্গাব্দ)

২। দি মৌরিয়াজ রিভিজিটেড, ১৯৮৭ : *অশোকা এ্যান্ড দি ডিক্‌লাইন অফ্ দি মৌরিপ্রাস্ (১৯৬৩)*

৩। রোমিলা থাপার (সম্পা) : *রিসেন্ট পার্সপেকটিভ্‌স্ অফ্ আর্লি ইন্ডিয়ান হিস্টরী (১৯৯৫)*

৪। আর. সি. মজুমদার (সম্পা) : *দি এজ্ অফ্ ইম্পিরিয়াল ইউনিটি (১৯৫১); দি ক্লাশিকাল এ্যাকাউন্টস্ অফ্ ইন্ডিয়া*

৫। আর. পি. বাংগলে : *দি কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, তৃতীয় খণ্ড (১৯৩২)*

৬। টি. ডব্লু. ম্যাকক্রিণ্ডল : *এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া এ্যান্ড ডেসক্রাইব্‌ড বাই মেগাস্থিনিস এ্যান্ড আরিয়ান (১৯২৩)*

৭। ভি. আর. আর. দিক্‌সিতার : *মৌরিয়ান পলিটি (১৯৩২)*

৮। কে. এ., এন. শাস্ত্রী : *দি এজ্ অফ্ নন্দাস্ এ্যান্ড মৌরিয়ান (১৯৬২)*

৯। বি. এন. মুখার্জী : *দি ক্যারেকটার অফ্ দি মৌর্য এম্পায়ার (২০০০)*

১০। আর. কে. মুখার্জী : *চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এ্যান্ড হিস্ টাইমস্ (১৯৫২)*

১১। ডি. সি. সরকার : *অশোকান স্টাডিস্ (১৯৭৯)*

১২। এইচ. সি. রায়চৌধুরী : *পলিটিকাল হিস্টরী অফ্ এন্‌সিয়েন্ট ইন্ডিয়া, (১৯৯৬)।*